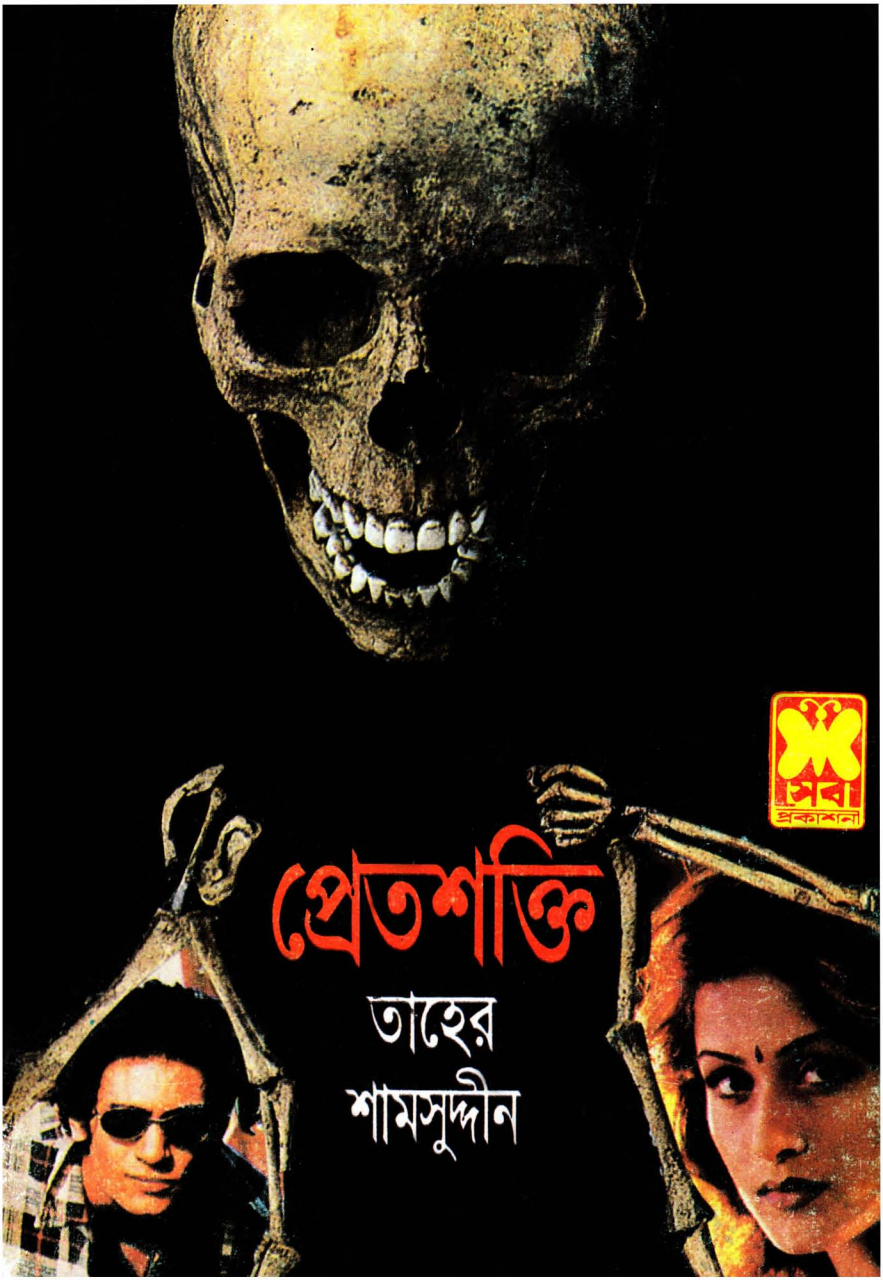
সেবা
প্রকাশনী
প্রেতশক্তি
তাহের
শামসুদ্দীন

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

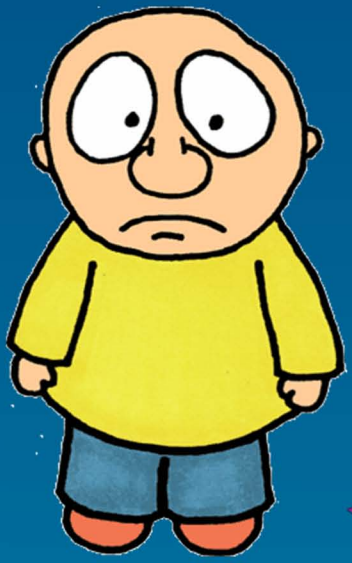

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

আধিভৌতিক উপন্যাস

প্রেতশক্তি

তাহের শামসুদ্দীন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 - 16 - 0172 - 9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: আলীম আজিজ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

PRETSHOKTI
By: Taher Shamsuddin

ছাব্বিশ টাকা

প্রেতশক্তি

মন্ট্রিলের প্লেস দ্য আর্ট-এর প্রদর্শনীতে বিরাট সাফল্যের পরে মকবুল ফিদা হুসেন-এর খ্যাতি সীমা অতিক্রম করে যায়। শরীফদের সাথে ফিদা হুসেনের পরিচয় অনেকদিনের। অনিতা তাঁর ভক্ত। গুরু মানেন তাঁকে। হুসেন ভারতের অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পদ্মবিভূষণ লাভ করার পরে শরীফ দম্পতি তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য ছুটে যান দিল্লী পর্যন্ত। দিল্লীতে দেখা হয় বাল্যবন্ধু সাগর সোমের সাথে। সাগর ঢাকার ছেলে। জন্ম টিকাটুলিতে। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রির পরে পরিবারসহ চলে যায় কলকাতায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে ওরা আর ফিরে আসেনি। মামারা কলকাতায় আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁরা আসতে দেননি। সাগর আসত আগে। বছর-দু'বছরে একবার এসে দেখা করে যেত পুরানো বন্ধুদের সাথে। এখন আর পারে না। ভীষণ ব্যস্ত। ক্রাইম রিপোর্টার হিসাবে ভারতজোড়া নাম। দিল্লীর 'দি সিটাডেল' পত্রিকার কলকাতা ব্যুরোর চীফ।

শরীফদের দেখেই আনন্দে আত্মহারা হলো সাগর। বলল, 'কি সৌভাগ্য আমার! তোদের এসময় দিল্লীতে দেখব এটা স্বপ্নেও ভাবিনি।'

'হুট্ করে চলে এলাম। অনিতার গুরু দর্শন! বুঝলি না?' জবাব দিলেন শরীফ আযাদ।

হো হো করে হাসল সাগর। বলল, 'বুঝেছি, বুঝেছি, মকবুল ফিদা হুসেন তো? কি যে যাদু জানেন বুড়ো। আশি বছর পার হয়ে গেল, এখনও মেয়ে ভক্তরা পতঙ্গের মত ঘিরে থাকে।'

'যা বলেছিস ভাই। আমার তো ভয় হয় অনিতা কোন্‌দিন আমাকে জবাব দিয়ে বসে,' বলল শরীফ।

'এ্যাই, চুপ্ কর। কি যা-তা বলছ? হুসেন শিল্পী, প্রেমিক, জীবনের রূপকার। শিল্পকে যারা ভালবাসে, বোঝে, তারা হুসেনকে ভালবাসে।

তুমি তো তাঁর জন্য আরও পাগল।' জবাব দিল অনিতা কুপিতভাবে।

সে রাতেই ওরা তিনজন রওনা হলো কলকাতার পথে। কথায় কথায় সাগর সোম জানতে চাইল শরীফের লেখালেখির কথা। বলল যে শরীফের তিনটা ক্রাইম থ্রিলার পড়েছে সে। একদিন সকালে, লোভে পাপ, আর মৃত্যুর কারিগর। ভাল লেগেছে। জানতে চাইল আর কিছু হাতে আছে নাকি।

শরীফ বলল, আরও দুটো বই বেরিয়েছে—শিবসেনার মৃত্যু ফাঁদে, আর মনিকার সুখ। এখন হাত খালি। একঘেয়ে হয়ে যাচ্ছে যেন। কেবল ক্রাইম, ষড়যন্ত্র, খুন, রহস্য উদঘাটন। এবার ভাবছে নতুনত্বের স্বাদ দেয়া যায় কিনা।

কলকাতায় সাগরের সুন্দর ফ্ল্যাটে দু'দিন কাটাল শরীফরা। কলকাতার পথঘাট, পরিবেশ এখন দু'এক বছর আগের চাইতে অনেক পরিচ্ছন্ন। আর পাতাল রেল তো চমৎকার। শিশির মঞ্চে শাঁওলী মিত্রের একক অনুষ্ঠান 'নাথবতী অনাথবৎ' দেখল। তুলনাহীন। মা তৃপ্তি মিত্রকে ছাড়িয়ে গেছেন মেয়ে। দ্বিতীয় দিন দেখল এক নাটক। না। শম্ভুমিত্র, উৎপল দত্ত কলকাতার নাটককে যেখানে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেখান থেকে আর বেশিদূর আগাতে পারেনি। নাটকের ক্ষেত্রে অন্তত পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ।

সাগর একমত হলো শরীফের সাথে। তারপর কথায় কথায় এক সময় বলল, 'নতুন স্বাদের ক্রাইম স্টোরির কথা বলছিলি না? আমার হাতে একটা কাহিনী আছে। আমি নিজেই জড়িত ছিলাম। শুনবি নাকি?'

'ক্রাইম স্টোরি শুনব না? বলিস কি সাগর?'

'শোন তাহলে।'

এক

বছর কয়েক আগের কথা। চম্বলের দস্যুদের চাঞ্চল্যকর কাহিনী একের পর ছাপিয়ে, দস্যুসর্দার আর নায়িকাদের লোমহর্ষক কার্যকলাপ, নৃশংসতা, উদারতা, প্রতিহিংসার বিস্তৃত বিবরণ আর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য, প্রেম, ঈর্ষা, হিংস্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইত্যাদির প্রায় নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে আর. কে প্যাটেলের 'দি সিটাডেল' প্রথম নজরে পড়ে দিল্লীর পাঠকদের। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা বাড়তে থাকে হু হু করে। দিল্লীর সীমানা ছাড়িয়ে দি সিটাডেল-এর নাম আর চাহিদা ছড়িয়ে পড়ে ভারতের প্রতিটি অঙ্গরাজ্যে এবং প্রধান প্রধান শহরে। এক তরুণ ভাগ্যান্বেষী হিসেবে যোগ দিয়েছিলাম দি সিটাডেল-এ। অভিজ্ঞতা কিছুই ছিল না। দিল্লীর বিখ্যাত রাজনৈতিক কলামিস্ট পরেশ ব্যানার্জীর সাথে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল একদিন নেহায়েত ঘটনাচক্রে। প্যাটেল সাহেবের বন্ধু। তিনি একবার বলতেই প্যাটেল নিয়ে নেন আমাকে নতুন পত্রিকার জুনিয়ার রিপোর্টার হিসাবে। প্রথম এসাইনমেন্টই পড়ল চম্বলে। দুর্ধর্ষ দস্যু মিলখা সিং আবার সক্রিয়। আমাকে তার সম্পর্কে, তার অতীত আর বর্তমান এবং প্রভাব, শক্তি, ও ভবিষ্যৎ তৎপরতার সম্ভাব্য ক্ষেত্র, মধ্যপ্রদেশ আর ইউপি পুলিশের স্নায়ুযুদ্ধ ইত্যাদির ওপর সর্বশেষ

তথ্যভিত্তিক রিপোর্ট দিতে হবে। একদিকে অন্যান্য সর্ব ভারতীয় পত্রিকার বাঘা বাঘা রিপোর্টার। অন্যদিকে নামলাম আমি। প্রায় সকল অর্থেই নাবালক। আমার প্রধান ভরসা ঝুঁকি নেবার, এমনকি প্রাণের ঝুঁকি নেবার দুঃসাহস। তারই জয় হলো শেষ পর্যন্ত। পুলিশ কর্তাদের পেছনে, প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলোতে কালক্ষেপণ না করে ঢুকে পড়লাম চম্বলের গহন অরণ্যে। ভয়ঙ্কর, হিংস্র, নির্মম, রক্তপিপাসু দস্যুদের বিচরণ ক্ষেত্রে। মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও মরিনি। ওরা আমাকে মারেনি। আমার সাহস, আমার তারুণ্য, আমার অকপটতা বোধহয় প্রভাবিত করে তাদেরকে। তাদের বিশ্বাস জন্মায় আমি তাদেরকে কেবল দস্যু নয়, মানবতাহীন পশু নয়, মানুষরূপেই দেখি এবং মানুষ হিসাবেই তাদের পুনর্বাসন চাই। চম্বলের ভয়ঙ্কর জঙ্গলে এটাই হয়ে দাঁড়ায় আমার রক্ষা-কবচ।

আমার রিপোর্টগুলো একের পর এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। দি সিটাডেল-এর জয়জয়কার পড়ে যায়। মিলখা সিং, গব্বর সিং, মানসিং, ফুলন দেবী···কত নাম, কত কাহিনী। কিন্তু সব কিছুর মত দস্যুদেরও শেষ আছে। শেষ নেই কেবল আমার এডিটর আর, কে, প্যাটেলের অন্য সবাইকে, সব পত্রিকাকে ছাড়িয়ে শীর্ষে অবস্থানের আকাঙ্ক্ষার। দি সিটাডেল ছাড়া আরও কয়েকটি পত্র-পত্রিকার মালিক সম্পাদক তিনি। তাঁর মটো হচ্ছে: খবর না থাকলে সৃষ্টি করতে হবে। খবর পাওয়া হচ্ছে পাঠকের অধিকার। খবর হচ্ছে পাঠকের খোরাক। এ অধিকার এবং খোরাক গরম গরম পরিবেশনই হচ্ছে সাংবাদিকের পবিত্র দায়িত্ব।

সারা দিনের ব্যস্ততার পরে পার্ক হোটেলের বারে বসে সবে হুইস্কির গ্লাসে একটা চুমুক দিয়েছি, অমনি বেয়ারা এসে বলল, 'স্যার, আপনার

ফোন।'

বিগড়ে গেল মেজাজটা। গ্লাসটা ঠকাস্ করে রেখে উঠে গিয়ে ধরলাম রিসিভারটা। 'হ্যালো' বলতেই ভেসে এল চীফ রিপোর্টার মি. শেঠ-এর কণ্ঠস্বর।

'সাগর নাকি? এখনি বসে গেছ?'

'কেন, রাতেও তোমাদের মুখচন্দ্রের ধ্যান করব নাকি? এক-আধটু গলা ভেজাতেও পারব না?'

'আরে পারবে, পারবে,' বললেন প্রতাপ শেঠ হাসতে হাসতে। 'গলা ভেজাও, ইচ্ছে হলে তলাও। তবে আগে তোমার নতুন দায়িত্বের কথাটা শোনো।'

'নতুন দায়িত্ব? কি ব্যাপার! চাঁদে পাঠাতে চাও নাকি?'

'শোনো সাগর, বস্ একটা কাণ্ড করে বসেছেন। দেবদাস সামন্তকে তো জানো। আরে সেই ম্যাজিশিয়ানটা। ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ায় শহরে শহরে। আবার মদখোর জুয়াড়ীও বটে। ক'দিন আগে এসে প্যাটেল সাহেবের ঘরে ঢুকে হাউমাউ করে কেঁদে বলে তার মেয়ে হারিয়ে গেছে। সর্বশেষ খবর জানে যে মেয়েটিকে দেখা গিয়েছিল আগরতলা শহরে। ত্রিপুরা রাজ্যে। সেখান থেকে তার মেয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। দেবদাসের ধারণা, ত্রিপুরার কোন উপজাতীয় দস্যুদল অপহরণ করেছে মেয়েটিকে। কেন্দ্রীয় সরকার বা ত্রিপুরার রাজ্য সরকারের দ্বারস্থ হতে চায় না লোকটা। সে চায় দি সিটাডেল তার মেয়েকে উদ্ধার করে দিক।'

'দিক। সিটাডেল যদি দায়িত্বটা নেয়, নিক না। কিন্তু আমার ওতে কি করার আছে? চম্বলের দিন আর নেই,' বললাম একটু চড়া স্বরে।

'মাথা গরম কোরো না সাগর। দেবদাসের কান্নায় মন গলে যায় প্যাটেল সাহেবের। খবরটা ছেপে দেয়া হয় প্রথম পৃষ্ঠায়। তুমি দেখোনি?'

'হ্যাঁ দেখেছি। ছবিসহ বক্স করা খবর। "দস্যুকবলে সুন্দরী তরুণী।" খবরের নিচে এক লক্ষ টাকা পুরস্কারের ঘোষণাও রয়েছে। আরও বলা হয়েছে যে দি সিটাডেল দেশব্যাপী সন্ধান শুরু করেছে। পুরস্কারের টাকাটাও বোধ হয় সিটাডেলই দেবে, তাই না?'

'হাঁ, ঠিকই ধরেছ। প্যাটেল সাহেবকে তো জানো। "দস্যু" শব্দ শুনলেই লাফিয়ে ওঠেন। অবশ্য খুঁটিটা হচ্ছ তুমি। তাঁর কল্পনা, তুমি ত্রিপুরার জঙ্গল থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। মেয়েটির বাপ এক নাগরিক অনুষ্ঠানে অপেক্ষায় বসে থাকবে। বাপ-মেয়ের মিলন হবে। প্যাটেল সাহেব পুরস্কারটা তুলে দেবেন তোমার হাতে। দারুণ আইডিয়া, কি বলো?'

'এতদিনে নিশ্চিত হলাম যে বসের মাথাটা সত্যি বিগড়ে গেছে। নড়ে গেছে নাট-বল্টু সব।'

'তুমি তা বলতে পারো। কিন্তু কাজটা তোমাকে করতে হবে সপ্তাখানেকের মধ্যে, নইলে তোমার চাকরি খতম!'

'দেখো শেঠ, মগজ পুরোপুরি বিগড়ে গেলেও প্যাটেল আমাকে চাকরির ভয় দেখাবেন না। তিনি জানেন আমাকে লুফে নেয়ার জন্য অনেকেই প্রস্তুত।'

'সোম, ড্রিঙ্কটা শেষ করে তোমার অফিসে যাও। একটা ফ্যাক্স বার্তা পাবে। ওতে সব জানবে।'

অফিসে গিয়ে বার্তাটা পড়ে বুঝলাম যে মেয়েটাও দক্ষ যাদুকর।

নাচেও। দারুণ সুন্দরী। বড় বড় হোটেলে 'শো' করে বেড়াত। কিছুদিন আগে ঝগড়া করে বাপকে ছেড়ে চলে যায়। মেয়েটির নাম রিমকি—রিমকি সামন্ত। দেখলে চোখ সরানো যায় না। হয়তো আগরতলায় কোন হোটেল-মোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে আছে। ঘুরে বেড়াচ্ছে পাহাড়ী রাজ্যটায়। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে প্যাটেল সাহেব মনে করেন তাকে দস্যুরা অপহরণ করেছে। ওসব দস্যু কিংবা সন্ত্রাসবাদী দল বা গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করার কায়দা-কৌশল তোমার জানা। কেউ যদি তাকে অপহরণ বা গুম না-ও করে থাকে তবুও কোন জানাশোনা দল বা গ্রুপকে ঘুষ দিয়ে হলেও অপহরণের একটা ঘটনা সাজাতে পারবে। এজন্য টাকা যত লাগে প্যাটেল সাহেব দেবেন। তুমি খুঁজে বের করো মেয়েটিকে। তারপর একটা নকল অপহরণের ঘটনা ঘটাও এবং পরে উদ্ধার করো। তোমার বুদ্ধি আছে। যোগাযোগ আছে। তাছাড়া ত্রিপুরা-মেঘালয়-আসাম তোমার ব্যুরোর আওতায়। তুমি বসের মুখ রক্ষা করো, আর পুরস্কারের টাকাটা নাও।'

বার্তাটা পড়ে একটা বিশ্রী গাল দিলাম শেঠকে। ভাবলাম, পুলিশী ঝামেলায় পড়লে আমাকে কে রক্ষা করবে? নকল অপহরণটা আমিই ঘটিয়েছি এটা যদি রাজ্য পুলিশ জেনে যায়?

এ পর্যন্ত শোনার পর শরীফ বলল, 'মনে হচ্ছে তোর কাহিনীটা সত্যি নতুন ধরনের এবং জমবে। বলে যা। কিছু বাদ দিবি না।'

দুই

রিমকির ব্যাপারে আরও কিছু বলার আগে তোকে বলি ডাক্তার ঘোষাল আর তার চেলা সুবল দাসের সাথে রিমকির পরিচয়ের ঘটনা। ওরা বসেছিল আগরতলার কামান চৌমুহানির এক রেস্তোরাঁ-কাম-বারে। টানছিল খাঁটি ধান্যেশ্বরী। হঠাৎ বাঙালী-পাহাড়ী খদ্দেরদের ভিড় ঠেলে দেখা দিল এক সুন্দরী তরুণী। সুবলের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল মেয়েটিকে দেখে। লাফিয়ে উঠতে গেল সে।

'সুবল, তোমাকে কতবার বলতে হবে যে নারী হচ্ছে বিষের মত,' বলল বুড়ো ডাক্তার ঘোষাল।

'কিন্তু কি দেখলাম ডাক্তার? মরীচিকা নয় তো?'

'থামো! সব কিছুরই স্থান-কাল বিচার করবে। নইলে...'

'ঠিক আছে। আমরা এই জংলী রাজ্যে আর কত ঘুরব? এর চাইতে কলকাতা হাজার গুণ ভাল,' বলল সুবল। বছর ত্রিশ বয়স তার। ষণ্ডা মার্কা চেহারা। খুন-খারাবি কিছু একটা করে পালিয়েছে কলকাতা থেকে। ত্রিপুরা রাজ্যে এসে অনেকটা নিরাপদ ভাবছে নিজেকে। জুটে গেছে ডাক্তার ঘোষালের সাথে। ঘোষাল এক অদ্ভুত মানুষ। ভুয়া নয়—আসল ডাক্তার। তবে মাথায় কিছু ছিট থাকতে পারে। নিজের

আবিষ্কৃত কিছু অষুধ আছে তার। সেসব বিক্রি করে নানা জায়গায় ঘুরে। বিশেষ করে গরীব, পাহাড়ী উপজাতীয় লোকদের মধ্যে। সুবল তার দেহরক্ষী। সুবল পাশে থাকলে গুণ্ডা-বদমাশরাও ঘাঁটায় না ঘোষালকে।

অষুধ বিক্রিতে লাভ যা হয় ভাগ করে নেয় দু'জনে।

'কলকাতায় গেলে খাব কি? ওখানে কেউ কিনবে আমার অষুধ?'

কিন্তু সুবলের কানে গেল না ঘোষালের কথা। সে তখন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে দরজার দিকে। 'ডাক্তার, মাথা ঘুরিয়ে দিল যে! দেখো না একটু!'

মেয়েটিকে আবার দেখা যাচ্ছে। বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে।

'সুবল, ওই মেয়ে তোমার শ্রেণীর নয়। হাত বাড়ালে পুড়ে যাবে,' হুঁশিয়ার করে দিল ডাক্তার ঘোষাল।

'আমি যাব না। তুমি গিয়ে একটু কথা বলো না। মনে হয় স্বাধীন, একা।'

ডাক্তার ঘোষাল উঠে দাঁড়াল। বুড়ো মানুষ সে। গায়ে পড়ে কথা বলতে গেলে মেয়েটি নিশ্চয়ই রাগ করবে না।

কাছে যেতেই মৃদু হেসে মেয়েটি বলল, 'নমস্তে,'

'নমস্তে। মাফ করবে,' বলল ঘোষাল বিনয়ের সাথে। 'তুমি কি অপেক্ষা করছ কারও জন্য? এ জায়গাটা তো কোন তরুণীর একা আসার জন্য উপযুক্ত নয়।'

'জায়গাটা খারাপ কিসের? আমি এক সপ্তাহ ধরে যাওয়া-আসা করছি। কিছুই তো ঘটেনি!'

'তোমার সাথী আসা পর্যন্ত আমাদের টেবিলে বসতে পারো,' বলল

ঘোষাল।

হাসল মেয়েটি খিলখিল করে। 'আমি কারও জন্য অপেক্ষা করছি, নিজেকে নিজে সামলাতে পারি না, এ ধারণা আপনার হলো কেন বাবা?'

'মাফ করো, মা। তুমি অভিজ্ঞ মেয়ে। বুঝতে পারিনি।'

'হয়েছে, লজ্জা পেতে হবে না। আপনার যুবক চেলাটি পাঠিয়েছে তো আপনাকে? ঠিক আছে, চলুন।'

মেয়েটি এল ওদের টেবিলে। সুবলের চোখ দুটো ঠিকরে বেরুচ্ছে কোটর থেকে। ভদ্রতা করে উঠে দাঁড়াতেও ভুলে গেল সে।

'তোমার মনে হচ্ছে সূঁচ-সুতোর দরকার,' বলল মেয়েটি সুবলের দিকে ঝুঁকে।

'কি বললে?'

'বাদ দাও। ভেবেছিলাম তোমার প্যান্টের বোতাম ছিঁড়ে গেছে। নাকি, আধুনিক মস্তানদের মত মেয়েদের প্রতি সৌজন্য দেখাতে উঠে দাঁড়ানোর প্রয়োজন বোধ করো না? চেহারা দেখে তো মনে হয় কলকাতাইয়া মস্তান। বড় ওস্তাদদের হুকুমে বোমা-পিস্তলও নাড়াচাড়া করেছ। বলো, ঠিক কিনা।'

রেগে গেল সুবল। চোখে আগুন ঝরিয়ে বলল, 'বড় বেশি চালাক মনে হচ্ছে? তোমার মত মেয়ে অনেক দেখেছি।'

'আহা, রাগ করছ কেন। ঠাট্টা করলাম একটু। তো নামটা কি তোমার?'

'নাম সুবল। সুবল দাস।'

'বেশ সুন্দর নাম। আপনি কে?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটি ডাক্তারকে।

ডাক্তার তার পরিচয় দিল।

'ও, আপনি তাহলে আসল ডাক্তার। বেশ ভাল। আমি রিমকি, রিমকি সামন্ত। খুশি হলাম আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে।'

ডাক্তার ঘোষাল বলল, 'তোমার জন্য কি আনতে বলব, চা না কফি? আমরা যা টানছি তুমি তো তা পছন্দ করবে না।'

'কেন পছন্দ করব না? ধান্যেশ্বরী আমারও পছন্দ।'

বয়কে আরেক গ্লাস আনতে ইশারা করে ডাক্তার বলল, 'এবার আমাদের জানাজানিটা আরেকটু ভাল করেই হোক না। আচ্ছা মা, এখানে তুমি কি করছ বলবে কি?'

রিমকি বলল, 'আমার কাহিনী শুনতে তোমাদের ভাল লাগবে? কি আশ্চর্য, জানাশোনা ছাড়াই তোমাদের আতিথ্য নিচ্ছি। আসলে কি জানো? আমার গোপন করার কিছু নেই। মুম্বাইয়ের জাগরণ পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টার ছিলাম। ওরা আমাকে হঠাৎ বিনা নোটিশে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।'

'কলার ছোবড়ার মত?' প্রশ্ন করল সুবল।

'কলার ছোবড়ার মত নয়, ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের মত। তবে ছেঁড়া হলেও স্যাণ্ডেল তো? এখনও মওকা পেলে কারও গালে পড়তে পারি।'

'দেখো, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করব না যতই তুমি আমাকে উস্কানি দাও। খবরের কাগজওয়ালাদের আমি ঘাঁটাতে চাই না। ওরা মারাত্মক বিষের মত। একবার এক রিপোর্টারকে হুইস্কির বোতল ঘুষ না দেয়ায় সে তার কাগজে আমার গুণ্ডামীর এক লম্বা ফিরিস্তি ছাপায়। পুলিশ লাগে আমার পেছনে। ওই ব্যাটারা ভয়ানক নচ্ছার,' বলল সুবল।

'আমিও সে রকম হতে পারি, যদিও এ মুহূর্তে আমার চাকরি নেই।'

বয় এসে গ্লাসভর্তি ধেনো মদ দিয়ে গেল। যাবার আগে মৃদু হাসল রিমকির দিকে ঝুঁকে। এর মানে, রিমকিকে সে চেনে। গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিয়ে রিমকি প্রশ্ন করল, 'আমার কাহিনী শুনলে, এবার তোমরা কি করো, বলো।'

ডাক্তার ঘোষাল বলল, 'আমি রোগবালাই সারাই। বহু বছর নানা ভেষজ অষুধ পরীক্ষা করে কয়েকটা আশ্চর্য নিরাময়কারী অষুধ বানিয়েছি। সুবল হচ্ছে আমার সহকারী।'

'চমৎকার তো? কি অষুধ ওগুলো?'

একটা হচ্ছে আমার সঞ্জীবনী বটিকা। এই যে সুবল দাস। সে ছিল পাতলা, লিকলিকে, দুর্বল। এখন দেখো কেমন তাগড়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাগড়াই বটে। মনে হয় পালোয়ান,' হেসে বলল রিমকি।

'তারপর রয়েছে বক্ষ উন্নয়ন বটিকা। ওটা সেবন করে বহু স্ত্রীলোকের দেহ সৌষ্ঠব বেড়েছে। ওরা সুখী হয়েছে এই আশ্চর্য অষুধের গুণে।'

সুবল বলল, 'এক কৌটা ব্যবহার করে দেখো না শ্রীমতি। দাম বেশি না, মাত্র আড়াই রুপী। একেবারে ধন্বন্তরী অষুধ।'

'কি বলছ সুবল? ওরকম বলে না। রিমকি মা'র ফিগার এমনিতেই সুন্দর। ওর বড়ি লাগবে না,' ডাক্তার সংযত করতে চাইল সুবলকে।

'চেহারা সুন্দর আর ফিগার ভাল এক কথা নয়। ফিগার অত ভাল হলে ওর চাকরি যেত না কখনও।'

'আমাদের বড়ি খেলে অবশ্য আরেকটু ভাল হত। তবে রিমকি মা'র যা আছে তাই যথেষ্ট,' বলল ঘোষাল।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রিমকি বলল, 'আমি তো

এতদিন ভেবে এসেছি আমার দেহ আকর্ষণীয়।'

'বেশি আত্মবিশ্বাস ভাল নয়। জানো তো, যুগটা প্রগতির। দুনিয়াটা কিভাবে এগুচ্ছে দেখো,' বলতে বলতে সুবল এক কৌটা বক্ষ উন্নতকারী বটিকা পকেট থেকে বের করে টেবিলে রাখল ঠকাস করে। বুঝলে বোনটি, তোমাকে বড় কিছু ভাবতে হবে। পিরামিডের কথা ভাব। যে লোকটা পিরামিড বানিয়েছে তার মনটা ছিল বড়। আমাদের এক কৌটা বড়ি খাও, দেখবে তুমি সব মেয়েদের ডিঙ্গিয়ে গেছ। অন্য মেয়েরা ঈর্ষায় জ্বলে যাবে তোমাকে দেখে। তোমার মাথায় খুশকি আছে কিনা সেটা ভাববে না কেউ। তখন কোন ব্যাটা তোমার চাকরি খাবে না। নাও কৌটাটি। দুই রুপী দিলেই হবে। পঞ্চাশ পয়সা ছাড় দেব, কারণ তোমাকে আমি পছন্দ করি।'

মাথা নেড়ে রিমকি বলল, 'আমার দরকার নেই।'

সুবল বলল, 'তুমি এখন তরুণী, ও রকম মনে হতে পারে তোমার। এটা রেখে দাও। একদিন কাজে লাগবে। আমাদের সঙ্গে তোমার আবার দেখা নাও হতে পারে। বয়স বাড়লে যেদিন দেখবে কোন ব্যাটা উপেক্ষার দৃষ্টিতে তোমার দিকে এক নজর তাকিয়ে অন্য মেয়ের দিকে তাকাল, তখন আফসোস হবে বড়িটা নাওনি বলে। এক কৌটা রেখে দাও সেই দুর্দিনের জন্য।'

'তোমার এই নাছোড়বান্দা সেলসম্যানটাকে সামলাও না কেন ডাক্তার?' একটু রাগতভাবে ঘোষালকে বলল রিমকি।

'রিমকিকে বিরক্ত কোরো না সুবল। জানি, তুমি ওর ভালর জন্যই বলছ। কিন্তু সে যখন চায় না' বলল ঘোষাল সুবলকে।

'আরে থামো তো। ওকে এটা নিতেই হবে। পরে ধন্যবাদ জানাবে

আমাকে। রত্না দেববর্মার কথা মনে নেই? প্রথমে আমার কথায় নাক শিটকেছিল। দু'বছর পরে দেখা হতেই কেমন কলকলিয়ে অভ্যর্থনা জানাল। জানাবে না? টেবিলের মত চ্যাপ্টা বুকটা যে তখন মিনারের মত খাড়া,' বলল সুবল।

'আমি হার মানলাম,' বলে রিমকি কৌটাটি রেখে দিল ওর ব্যাগে। দুটো রুপী তুলে দিল সুবলের হাতে।

সুবল একগাল হেসে তাকাল ডাক্তারের দিকে। ডাক্তারও খুশি সুবলের সেলসম্যানশীপের সাফল্য দেখে।

'আমাকে যখন এ জিনিস গছাতে পারলে তখন বুঝতে পারলাম টিপরা মেয়েদের তুমি কেমন সহজে বোকা বানাতে পারো,' বলে নিজের গ্লাসের দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে রিমকি ডাক্তার ঘোষালের ভরা গ্লাসটা ফেলে দিল বুড়োর কোলের ওপর।

ডাক্তার নড়ার আগেই চট করে দাঁড়িয়ে রিমকি বুড়োর বুক পকেট থেকে রুমালটা বের করে মুছতে লাগল বেচারার প্যান্টশার্ট। বিব্রতভাবে বসে রইল ডাক্তার।

'ইশ্, কি করে ফেললাম! কি অসাবধান আমি!'

'এটা কিছুই না। অঘটন ঘটে যায়,' বলে রুমালটা ফিরিয়ে নিয়ে ডাক্তার ভেজা জায়গাগুলো আরও ভাল করে মুছতে লাগল।

'তোমাকে ভিজিয়ে দেইনি তো?' বলতে বলতে সুবলের শার্টের সামনের দিকটায় হাত বুলাল রিমকি। 'না, তোমার গায়ে পড়েনি। আচ্ছা, আমি একটু হাতটা ধুয়ে আসি,' বলে রিমকি চলে গেল টয়লেটের দিকে।

সে চলে যেতেই সুবল ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন বুঝলে

মেয়েটিকে?'

'জানি না। এমন সুন্দরী মেয়ে, অথচ সঙ্গে কেউ নেই, একা। এটা কেমন করে হয়? আমার কেমন যেন সন্দেহ লাগে।'

সুবল বলল, 'আমি এ মেয়ের কাছে ঘেঁষতে পারব না। ওর জিহ্বাটা ক্ষুরের মত ধারাল। ও ফিরে আসার আগে আমরা কেটে পড়লে কেমন হয়?'

ঘোষাল বিল আনার জন্য ডাকল বয়কে। বলল, 'তোমার উন্নতি হচ্ছে। জ্ঞানগম্যি হচ্ছে। সুন্দরী মেয়ের মোহে পড়লে আমাদের লাভ হবে না। ওর জন্য বসে থাকার দরকার নেই। চলো কেটে পড়ি...' হঠাৎ থেমে গেল ডাক্তার। চোখ ছানাবড়া করে তাকাল সুবলের দিকে।

'কি হলো?'

'আমার টাকা! পকেট তো শূন্য!'

'তার মানে?' বলে সুবল সন্দিগ্ধ হয়ে নিজের পকেটে হাত দিল। রিমকি তাকে যে দু'রুপীর নোট দিয়েছিল সেটা এবং তার জমানো ১০ রুপীর চারখানা নোট নেই।

একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল তারা।

ডাক্তার ঘোষাল রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'দুনিয়ার সেই পুরানো চালাকি। আর আমরা তাতে ধরা দিলাম। আমার গায়ে ধেনোর গ্লাসটি ঠেলে ফেলে আমার যা ছিল সব নিয়েছে ঝেড়ে ঝুড়ে। ওতেও সন্তুষ্ট হয়নি সে। তোমাকেও ফতুর করে দিয়েছে।'

লাথি মেরে নিজের চেয়ারটি পেছনে সরিয়ে সুবল খেঁকিয়ে উঠল, 'আমরা বসে আছি কেন? ওই মেয়েকে ধরতেই হবে।'

বয় এল বিল নিয়ে। তাদের হাবভাব দেখে প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছে

বাবুরা?'

'আমাদের পকেট মারা হয়েছে। সরো তুমি পথ ছেড়ে,' বলল সুবল।

'কিন্তু মহিলাটি তো চলে গেছেন। বিল শোধের আগে তো তিনি কোন গ্রাহকের পকেট কখনও মারেননি। এটা যে খুব খারাপ হয়ে গেল।'

'তার মানে, তুমি মেয়েটিকে জানো?' একসঙ্গে প্রশ্ন করল দু'জনে।

'জানি বৈকি। দারুণ সুন্দরী। হাতের আঙ্গুলের কাজ চমৎকার। এ লাইনে ওরকম দক্ষতা ভাল।'

দু'হাত মুঠিবদ্ধ করে সুবল বলল, 'আমাদের কি হবে? আমরা কি কোন প্রতিকার পাব না?'

'কিন্তু আপনারাই তো তাকে টেবিলে ডেকে এনেছেন। আমি ভাবলাম আপনাদের চেনা।'

'আমাদের এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত। আপদ আমরাই জুটিয়েছি,' বলল ঘোষাল।

'কিন্তু বিলটা?' বিব্রত প্রশ্ন বয়টির।

'ওটা তার কাছ থেকেই আদায় কোরো। আমার তরফ থেকে বলে দিয়ো, যদি পাই কোনদিন, ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলব,' দাঁতে দাঁত ঘসে বলল সুবল।

'ওটা কোন কাজের কথা নয়, বাবু। সে আর না-ও আসতে পারে। আমার বিলটা শোধ করে দিন।'

'দেখো বন্ধু, তোমার লোকসান করাতে চাই না। তোমার কোন বান্ধবী আছে?' বলল সুবল।

এবার উজ্জ্বল হলো বেয়ারার মুখটা। 'আছে বাবু। এক্কেবারে পরীর মত। ওর মত মেয়ে আর হয় না।' সুবল চট করে বক্ষ উন্নয়ন বটিকার একটা কৌটা বের করে তুলে দিল বয়টির হাতে। বলল, দাম আড়াই রুপী। বখশীশ দিলাম তোমাকে। প্রেমিকাকে খাওয়াও। দেখবে তোমার পরী দু'দিনে পরীরাণী হয়ে গেছে।'

বয়টি কিছু বুঝে ওঠার আগেই লম্বা লম্বা পা ফেলে সে গিয়ে পড়ল রাস্তায়। ডাক্তার ঘোষাল তার আগেই বের হয়ে গেছে।

তিন

শরীফ, আমার সঙ্গে রিমকি সামন্তের দেখা কিভাবে হলো তা বলার আগে তোমাকে তার পূর্ব ইতিহাসটা বলা দরকার, যাতে তোমাকে কোন প্রশ্ন করতে না হয়।

রিমকি ডাক্তার ঘোষালকে বলেছিল যে একটি পত্রিকার রিপোর্টার ছিল সে। কথাটা মিথ্যা। গত পাঁচ বছর ধরে সে ছিল একজন 'সেয়ানা।' সেয়ানা কি জানো? পকেটমার—আঙ্গুলের কারিগর। তার বাপ দেবদাস সামন্ত ছিল যাদুকর। যাদুর ভেল্কি দেখিয়ে রোজগার করত। বেশি না, অল্পসল্প। রিমকি ঘুরত বাপের সঙ্গে। তার বয়স পনেরো হতেই দেবদাস তাকে বানাল নিজের সহকারী। বছর খানেক যেতে না যেতেই দেখা গেল যে হাত সাফাই, তাসের খেলা এবং অন্যান্য যাদুকৌশলে দিল্লি ও আশপাশে তার জুড়ি নেই। লোকের গা থেকে ফতুয়াটা খুলে নিলেও কেউ টের পায় না।

একদিন সন্ধ্যায় একটা ঘটনা ঘটে। ঘটনাটা তার ভবিষ্যৎ জীবনের গতিধারা বদলে দেয়। এক থিয়েটার হলে যাদুর খেলা দেখিয়ে সে বের হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এমন সময় তার বাবা এল এক যুবককে সঙ্গে নিয়ে। যুবকটি এক অষুধ কোম্পানীর ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট। দিল্লীতে

এসেছে নতুন কিছু ব্যবসার খোঁজে। স্টেজে রিমকিকে দেখে তার চোখ ঝলসে গেছে। এখন এসেছে নিজের টাকা দেখিয়ে রিমকির চোখ ঝলসে দিতে। সেরা হোটেলে ডিনার খাওয়াতে চায়। দেবদাস সামন্ত রাজি যুবকটির সঙ্গে রিমকিকে হোটেলে যেতে দিতে। সে জানে, মেয়েকে যা শিক্ষা দিয়েছে তাতে কোন অঘটন ঘটা সম্ভব নয়। মেয়ে জানে আত্মরক্ষার কায়দা-কৌশল।

যুবকটির নাম হেক্টর পেরেইরা। এক নামজাদা রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে দামী ডিনার খাওয়ায় সে রিমকিকে। ডিনারের সময় এক মারাত্মক ভুল করে ফেলে পেরেইরা। কোমরে বাঁধা চামড়ার বেল্টে অনেক রুপীর ব্যাঙ্ক নোটের মোটা বাণ্ডিল দেখায়। অত ব্যাঙ্কনোট রিমকি জীবনে দেখেনি। পেরেইরা বড়াই করে বলে যে ব্যাঙ্কে তার আরও গাদা গাদা টাকা আছে। রিমকি ভাবল লোকটাকে একটু ভড়কে দেবে। কথা বলতে বলতে নোটের বাণ্ডিলটি সে হাতসাফাই করে তুলে নেয়। রিমকির কাজটা ছিল অতি সহজ। বিল শোধ করার সময় কোমরে হাত দিয়ে পেরেইরা দেখে বাণ্ডিল উধাও। মাথায় চক্কর দিতে লাগল তার।

কয়েকজন বয় দাঁড়িয়ে গেল তামাশা দেখতে। রিমকি গেল ঘাবড়ে। সবাই তাকিয়ে দেখছে। সাহস করে সে বাণ্ডিলটা বের করে দিয়ে বলতে পারছে না যে এটা স্রেফ ঠাট্টার ব্যাপার।

মহা বিব্রত অবস্থায় রিমকি বসে রইল। পেরেইরা রিমকিকে সন্দেহ করতে পারল না। ভাবল, রিমকির মত সুন্দরী মেয়ে অমন কাজ করতে পারে না। তার মাথায় ঢুকল না যে রিমকি যাদুকর। যাদুকরের পক্ষে ওসব মোটেও অসাধ্য নয়।

পাশের টেবিলে বসেছিল এক প্রৌঢ় লোক। লোকটা উঠে এসে

হাল-জমানার তরুণ-তরুণীদের অসাবধানতা নিয়ে ছোটখাট এক লেকচার দিল। পেরেইরাকে রিমকির মত একজন তরুণীকে রেস্তোরাঁয় এনে এমন বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে বলে একটু বকুনিও দিল। পকেট থেকে ভারী মানিব্যাগ বের করে বিলটা শোধ করে দিল।

'আমার গাড়ি আছে বাইরে,' বলল লোকটা রিমকিকে। 'তোমাকে আমিই বাড়ি পৌঁছে দেব। এ ছেলেটা তোমার মত কচি মেয়ের সঙ্গী হবার যোগ্য নয়।'

সেদিন কিভাবে যে ওই রেস্তোরাঁ থেকে বের হয়ে এসেছিল আজ পর্যন্ত রিমকি তা জানে না। অন্ধকার রাস্তায় ছুটন্ত গাড়িতে ফুরফুরে বাতাস গায়ে লাগতেই আতঙ্ক তার কাটতে শুরু করে। প্রৌঢ় লোকটা তার পরিচয় জানতে চাইল। রিমকির বয়স মাত্র ষোলো-সতেরো হলেও সে নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়ানো মেয়ে। জানে, কিসে থেকে কি হয়। ক, খ-র পরেই আসে গ। সে বুঝে ফেলল যে লোকটিকে নিয়ে একটা ঝামেলা হবেই। লোকটা তাদের ডিনারের বিলটা নিশ্চয়ই রেস্তোরাঁওয়ালাদের খুশি করার জন্য খরচ করেনি। কাজেই, নিজের একটা ভুয়া নাম বলল সে। এবং এমন একটা জায়গায় থাকে বলল যে জায়গাটা গাড়ি যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে। উদ্দেশ্য, লোকটার মতলব যাচাই করা। সে যদি গাড়ি থামিয়ে উল্টো দিকে ঘোরায় তাহলে বোঝা যাবে মতলব খারাপ নয়। কিন্তু লোকটা তা করল না। সোজা সামনের দিকে চলল।

মেয়ে রুপসী হবে বোঝার পর দেবদাস তাকে আত্মরক্ষার উপায় শেখায়। দেবদাস জানত চোখকান খোলা না রাখলে তার পেশায় মেয়েরা বেশিদিন রূপসী থাকে না। তাই রিমকির পূর্ণ আস্থা নিজের

ওপর। এ লোকটাকে সে সামলাতে পারবে।

প্রৌঢ় লোকটা ভাবল আর দেরি করে লাভ কি। খরচটা তুলে নিলেই হয়। শহর ছাড়িয়ে গিয়েই সে এক ফাঁকা মাঠের মত জায়গায় নেমে গিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দেয়।

রিমকি মোটেই ঘাবড়ায়নি। বাপের শিক্ষা সে কাজে লাগাল। লোকটা তার দিকে ঘনিয়ে আসতেই তার নাকের ঠিক নিচটায় এক প্রচণ্ড আঘাত হানল। ঘুষি নয়, হাতের চেটোর আঘাত। ওই এক আঘাতেই কাবু হয়ে নেতিয়ে পড়ল লোকটা সীটের ওপর।

গাড়ির দরজা খুলে বের হলো রিমকি। অন্ধকার মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়াতে লাগল। মিনিট কয়েক যেতেই টের পেল যে তার হাতের মুঠোয় লোকটার মানিব্যাগ। ওটা কখন নিল তার মনেই নেই। কিন্তু এখন তো ফেরত দেয়ার উপায় নেই। হুঁশ ফিরে পেলে লোকটা তাকে জাপটে ধরবে। অগত্যা পেরেইরার নোটগুলোর সাথে এ ব্যাগটাও নিয়ে চলল দিল্লীর পথ ধরে।

ঘরে ফিরে দুয়ার বন্ধ করে দেখল, ডিনার খেয়ে এবং কার-এ চড়ে তার আর হয়েছে পাঁচ হাজার তিনশো বাহাত্তর রুপী।

গোটা রাত তার ঘুম হলো না। ভাবল চোখ খোলা রেখে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল ভোর হবার আগে।

ভাগ্য ভাল যে সেদিনই ওরা চলে যাচ্ছে কানপুর। পেরেইরা বা প্রৌঢ় লোকটার সাথে দেখা হয়ে যাবার ভয় নেই। নোটগুলো সে প্যান্টির নিচে পাতলা কাপড়ে বেঁধে ফেলল।

আরও দু'বছর কাজ করল। বাবার সহকারী হিসাবে। তারপর একদিন সুটকেসে সব কিছু গুছিয়ে বাপকে কিছু না বলেই বেরিয়ে গেল

আপন পথে। কোন শোকচিন্তা তার নেই। ভাগ্যের দুয়ার সে খুলবেই।

দু'বছর সে নিষ্ক্রিয় থাকেনি। হাত সাফাই চালিয়ে গেছে, তবে খুব সাবধানে। কাজটা খুবই সহজ। এত সহজে এত টাকা পাওয়ার লোভ সামলানো কঠিন।

তার প্ল্যান তৈরি। হাতে জমেছে পঁয়ত্রিশ হাজার রুপী। পনেরো হাজারে সে কিনে ফেলল একটা ভাল সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মারুতি। একটা চিঠি লিখে রেখে গেল বাবার জন্য। চিঠিতে বলল, অভাবী ও কঠোর জীবন তার ভাল লাগছে না। তার জন্য চিন্তার কারণ নেই। সে জানে, চিন্তা বাবা করবেও না। তার মদ-জুয়া তো আছেই।

রিমকি ড্রাইভিং শিখেছিল আগেই। ফলে গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক ধরে কলকাতার দিকে যাত্রা করতে কোন অসুবিধা হলো না। পরবর্তী দু'বছর একা একা ঘুরে বেড়াল সে কটক, পুরি, কলকাতা, দার্জিলিং, গ্যাংটক, শিলিং, গৌহাটি। তার ব্যাঙ্ক হচ্ছে হঠাৎ পরিচয় হওয়া পয়সাওয়ালা লোকদের পকেট। ম্যাজিক-ট্যাজিকও দেখিয়েছে অভিজাত রেস্তোরাঁয়। যেখানে সুযোগ পেয়েছে। পয়সার অভাব হলেই খুঁজে নিয়েছে কোন লুব্ধ পুরুষকে। তার হাতের আঙ্গুলের গতি এত দ্রুত এবং সে এত সাবধানী যে একবারও ধরা পড়েনি। একটা মানিব্যাগ তুলে নিয়ে কিছু রুপী সরিয়ে ব্যাগটি আবার রেখে দিতে পারে মালিকের পকেটে। এতে লোকগুলো প্রায়ই টের পায় না যে কিছু চুরি হয়েছে।

আগরতলায় এসেছে নতুনত্বের সন্ধানে। সিপিএম শাসিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিতে এখন বাঙালী প্রাধান্য হলেও টিপ্‌রা,জমাতিয়া, রিয়াং, রাংখল, নোয়াতিয়া, কুকি এবং আরও নানা উপজাতির বাস। তার কোন শেকড় নেই, সে স্বাধীন।

কামান চৌমুহানির বার-কাম-রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে দ্রুত পায়ে গিয়ে নিজের মারুতিতে উঠে জোরে চালিয়ে দিল রাজবাড়ির দিকে। কিছুদূর গিয়ে একটা নির্জন সরু রাস্তায় গাড়ি থামাল। আয়নায় চোখ ফেলে নিশ্চিত হলো যে কেউ পিছু নেয়নি। গুনে দেখল তার আজকের আয় এক হাজার সাতাশ রুপী।

'মন্দ নয়,' বলল মৃদু স্বরে। তারপরে ওই পথে সোজা বেরিয়ে গেল শহরতলির দিকে। একটা হোটেলের অদূরে আবার গাড়ি থামাল। আলো জ্বালিয়ে শহরের ম্যাপ খুলে দেখতে লাগল সামনে ঝুঁকে।

ওই অবস্থায় আমি তাকে আবিষ্কার করি। লাল রং-এর গাড়িটা গাঢ় সবুজ করা হয়েছে। কিন্তু চেহারা অবিকল ফটোর সঙ্গে মিলে যায়। ব্যাপারটা মনে হলো প্রায় ভোজবাজির মত। এ মেয়ে রিমকি না হয়ে পারে না। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে ভাবলাম একটু। না, আনাড়ির মত লাফ দিয়ে পড়লে হবে না। এখানে সে মুক্ত। পাখির মত উড়াল দিতে পারে যেদিকে ইচ্ছা। ডাকাত-দস্যুও নেই ত্রিসীমানায়। তাছাড়া সে অপহৃত না হলে তাকে ধরে আমার কি ফায়দা হবে? তার সঙ্গে আলাপ করেই যা করার করতে হবে। ভাবলাম, দি সিটাডেল-এর পুরস্কারের কথাটা নিশ্চয়ই সে শুনেছে। তাকে বলা উচিত যে লাখ রুপীর পুরস্কারটা ভাগ করে নেব দু'জনে। তাতেও যদি সে দিল্লী ফিরতে রাজি না হয়? একমাত্র উপায় হচ্ছে তাকে বোকা বানানো।

'গরুর মাথায় ঘাসের টুপি পরালে কেমন হয়? গরুরা কি টুপিগুলো খেয়ে ফেলবে?' বললাম গাড়ির দরজায় চাপড় মেরে।

শান্ত দৃষ্টিতে আমাকে এক নজর দেখে আবার ম্যাপে দৃষ্টি ফিরিয়ে সে বলল, 'কাছাকাছি কোন ইঁদারা থাকলে তাতে ঝাপ দিয়ে পড়ো গে।

না দেখলে লোকে কিচ্ছু বলবে না।'

একটু ভড়কে গেলাম তার জবাবে। না দমে বললাম, 'আমি কেবল বরফটা ভাঙার চেষ্টা করছিলাম। গাড়ি আর ম্যাপ দেখে ভাবলাম একটু লিফ্‌ট পাব।'

আবার আমাকে দেখে নিয়ে সে বলল, 'এটা বাস নয় ব্রাদার। আমি প্যাসেঞ্জার লই না।'

'প্যাসেঞ্জার নয়, তুমি বোধ হয় বলতে চাও যে অপরিচিত, মানে, স্ট্রেঞ্জার লও না।' কথা কাটাকাটিতে আমি তেমন পটু নই, তবে এবার জবাবটা বোধ হয় কিছুটা যুৎসই হয়েছে।

'এটা বাস নয়, বললাম না?'

'তুমি অপরিচিত লোক নাও না। কিন্তু আমার পরিচয় আছে। আমি সাগর সোম।'

'তোমার মায়ের কাছে তুমি মহাসাগর হতে পারো, আমার কাছে ডোবাও নও। গুড নাইট, যাও, কেটে পড়ো।'

মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলে গেলাম গাড়ির অপর পাশে। টান দিয়ে দরজা খুলে বসে পড়লাম। 'আহ্! পাছাটা কোথাও রাখতে পারলে কি আরাম!' বললাম মৃদু স্বরে।

'দেখো দাদা, আমি গোলমাল চাই না।'

'গোলমাল হবে কেন? আগরতলা শহরটা আর সহ্য হচ্ছে না। একটু হাওয়া বদল চাই। আমি আবার কিপটে কিনা, তাই মুফতে ভ্রমণে অভ্যস্ত,' বললাম মৃদু হেসে।

'তোমার কথায় কারিগরী আছে। তবে বলে দিচ্ছি, নেমে যাও। নইলে তোমাকে বিস্মিত হতে হবে।'

গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। কড়া নজর রাখলাম তার ওপর। জীবনে দু'চারজন গুণ্ডা মেয়ে যে সামলাতে হয়নি তা নয়। একেও কোন সুযোগ দিতে যাচ্ছি না। 'দেখো সুন্দরী, আগরতলায় আসার আগে আমি ছিলাম পেশাদার পালোয়ান। আমার প্রিয় খেলা ছিল রঙ্গমঞ্চে একটি মেয়ের কোমরবন্ধ কামড়ে ধরে শূন্যে তুলে ফেলা।'

চমকে উঠে সে বলল, 'তাই নাকি? কাজটা ছেড়ে দিয়েছ?'

'কাজটাই আমাকে ছেড়েছে। মেয়েটা ছিল পাঁজির পা-ঝাড়া। বোকা এবং বদরাগী। তাকে কামড়ে দেয়ার ইচ্ছা হত। অতিকষ্টে ইচ্ছাটা দমিয়ে রাখতাম। বুঝতেই পারছ, কামড়ে দেয়াটা কতই সহজ ছিল। একদিন আর সহ্য করতে না পেরে···।'

একটুখানি যেন দমে গেল সে। দেখলাম, আমাকে নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। শেষ পর্যন্ত নতুন পথ নিল। 'তোমার চলে যাওয়াই উচিত, নইলে আমি চেঁচাব।'

'চেঁচালেই ভাল হবে। তোমাকে চড় মারার একটা সুযোগ পাব। সুন্দরী মেয়েদের চড় মারার খুব শখ আমার। পারি না কেবল সুযোগ বা অজুহাতের অভাবে।'

'তুমি জেলেই যাবে,' বলে হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট দিল সে।

'রাগ কোরো না। ওতে গায়ের রং মলিন হয়। তুমি যাচ্ছ কোথায়—বিশালগড় না উদয়পুর?'

'উদয়পুর।'

'কোন চিন্তা নেই, বোন। আমাকে ভয়ের কোন কারণ নেই। কেবল এখানকার হাওয়াটা সহ্য হচ্ছিল না, আর বিনা পয়সায় ভ্রমণটা ভাল কিনা, তাই। উদয়পুরে গিয়েই নেমে যাব।'

'নামতে তোমাকে হবেই। তুমি কি আশা করো? তোমাকে বিয়ে করব?' জবাব দিল রিমকি।

'সেটা নির্ভর করছে তুমি কতটা সেকেলে তার ওপর। আমার ওসব সামাজিকতার দিকে ঝোঁক নেই। আচ্ছা বলো তো, তোমার নামটা কি?'

'নাম বলতে আমার বয়ে গেছে।'

'তাহলে কিভাবে ডাকব? হেই লক্ষ্মী সোনা, নাকি হাই বেবি?'

'তুমি কিছু না ডাকলেও আমার ওজন কমবে না। তোমার স্বরযন্ত্রটাকে একটুখানি বিশ্রাম দাও, আর ভান করো যে তুমি এখানে নেই।'

ঘড়িতে রাত সোয়া এগারো। বললাম, 'তোমার শর্তগুলো মানার আগে আমাকে বলো তো তুমি কি রাতের মধ্যেই উদয়পুরে পৌঁছতে চাও?'

জবাব পেলাম, 'বিশালগড়েই থামব। তারপর তোমাকে পুলিশের হাতে দিয়ে কোন হোটেলে গিয়ে উঠব।'

'তার পরিবর্তে আমরা যদি পালা করে চালাই, সকালেই পৌঁছে যাব বিশ্রামগঞ্জ। সেখানে একটা চমৎকার ফরেস্ট বাংলো আছে' বললাম তাকে।

'ও, আমি ঘুমাব গাড়িতে, আর তুমি চালাবে। তোমার আইডিয়াটা ভাল। কিন্তু সেই সুযোগ তোমাকে দিচ্ছি না।'

'তার মানে আমাকে ভয় পাও। তাহলে তো কিছু করার নেই।' মন্তব্য করলাম।

'কে বলল তোমাকে ভয় করি? আমাকে ভয় পাওয়াতে পারে এমন

দু'পেয়ে জানোয়ার আমার চোখে পড়েনি,' বলল রেগে গিয়ে।

ফিক করে হেসে বললাম, 'তাই যদি হয় হুইলটা ছেড়ে দাও আমার হাতে। তুমি ঘুমাও।'

এক সেকেণ্ড দ্বিধা করে গাড়ি থামাল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল আমাকে। চোখে যেন ফুটে উঠল হাসির ঝিলিক। হ্যাঁ, সুন্দরী বটে মেয়েটা।

'দেখো দাদা, কোন বেচাল যদি হয় তোমার চোখ খুলে নেব। বলতে পারবে না যে তোমাকে সাবধান করিনি।' বলে সে নামল গাড়ি থেকে। আমি হুইল ধরলাম।

'ব্যাক সীটে জায়গা বেশি। ওখানেই শোব। একটা টায়ার লীভার আছে ওখানে। মূল সড়ক থেকে কোথাও নামতে গেলেই ওটা দিয়ে মাথা ফাটাব। ওটা করার আগে টেলিগ্রাম করে তোমাকে জানাব না, বুঝলে?'

'লক্ষ্মী সোনা, আমাকে বিশ্বাস করো।'

'তোমাকে বিশ্বাস করার আগে পাগলা গারদে ভর্তি হব।'

চার

একটু পরেই দেখলাম ঘুমিয়ে পড়েছে সে। আমি রাতের ফাঁকা রাস্তায় ড্রাইভ করে গেলাম মাইলের পর মাইল। বিশালগড়ের কাছে পৌঁছতেই ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সে। থামলাম একটা হোটেলের সামনে। নেমে গিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বললাম। নিজের পরিচয় দিলাম। আইডি কার্ড দেখালাম। হঠাৎ মনে হলো কি পাগলামি করেছি। তাকে একা গাড়িতে রেখে এসেছি। যদি চলে যায়? ছুটে গিয়ে দেখি যায়নি। বললাম, 'নামো। স্নান সেরে বারান্দায় বসে ব্রেকফাস্ট।'

এই প্রথম তাকে হাসতে দেখলাম। বন্ধুত্বের হাসি। বুঝলাম মেয়েটার সঙ্গে ভাব করা যাবে। বললাম, ব্রেকফাস্টের পরে একটু মন খুলে কথা বলব দু'জনে, কেমন?'

সে বলল, 'একা থাকতে চাই। তুমি লিফট চেয়েছ, দিয়েছি। এখন বোধ হয় বিদায় জানানো উচিত।'

'হাস্যকর কথা বোলো না,' বললাম শক্ত হাতে বাহু ধরে তাকে হোটেলের দিকে টানতে টানতে। 'তুমি আমাকে ছেড়ে কেটে পড়লে ব্রেকফাস্টের দামটা দেবে কে?'

বিশালগড়ের আবহাওয়া আগরতলার চাইতে খারাপ। তীব্র গরম।

রিমকি স্নান করেছে, পোশাক বদলেছে। আরও সুন্দর এবং তাজা দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু মন নরম হয়নি। ব্রেকফাস্টের পরেই বলল, 'উদয়পুর গিয়েই আমরা আলাদা হয়ে যাব।'

'উদয়পুরে না গেলে হয় না? এখানেই থাকো না দু'একদিন। উপজাতীয়রা আছে আশপাশের গ্রামে, পাহাড়ে। বেড়াব, দেখব, আলাপ করব।'

'না, আমার সময় নেই নষ্ট করার,' বলল সে।

'তোমার নামটা বলবে না?'

'রিমকি সামন্ত' বলল সে হেসে।

তার মুখ থেকে শোনার দরকার ছিল না, তবু নিশ্চিত হলাম।

'সুন্দর নাম।'

আমরা কথা বলছি, এমন সময় একটা ট্রাক এসে দাঁড়াল হোটেলের সামনে। এক বুড়ো মত ও এক জোয়ান তাগড়া লোক নামল ট্রাক থেকে। রিমকি হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠতে গিয়ে আবার বসে পড়ল।

'ওরকম করলে কেন? কামড়েছে কিছুতে? চেনো নাকি ওদেরকে?' প্রশ্ন করলাম তাকে।

'আমার পেয়ারের দোস্ত। তুমিও প্রেমে পড়ে যাবে ওদের,' বলল তিক্তকণ্ঠে।

লোক দু'জন বারান্দায় উঠে রুষ্ট ভঙ্গিতে তাকিয়ে রইল নীরবে।

রিমকি বলল, 'নমস্তে, নমস্তে। ভাবছিলাম তোমাদের নিয়ে।'

'ভাবছিলে বৈকি,' বলল তাগড়া জোয়ানটি চিবিয়ে চিবিয়ে।

'এ হচ্ছে সাগর সোম,' রিমকি বলল আমার দিকে তাকিয়ে। 'আর এরা হচ্ছে ডাক্তার ঘোষাল আর নোংরামুখো ভদ্রলোকটি হচ্ছে সুবল

দাস।'

'বসুন, ডিম-রুটি খান,' বললাম আমি।

'আমার ডিমের দরকার নেই,' বলল সুবল রিমকির দিকে একটা মোটা আঙ্গুল উঁচিয়ে।

'সুবল বাবু হয়তো ধেনো চান,' হেসে বলল রিমকি।

'আমরা আমাদের পাওনা চাই, নিজেদের গাঁটের পয়সা।'

'বসো, বসো, একটা কিছু খাও।' বলল রিমকি।

মারমুখী ভঙ্গিতে রিমকির দিকে এক পা এগিয়ে সুবল বলল, 'আমার পকেট হাতিয়ে যা নিয়েছ বের করো, নইলে ঘাড় ভেঙ্গে দেব।'

রিমকি ঘোষালকে বলল, 'ওকে রোদের মধ্যে ফেলে রেখেছিলে নাকি? ওর মাথার চাঁদি যেন গরম হয়ে গেছে?'

'দেখো মেয়ে, ওসব ইয়ার্কিতে চলবে না। আমাদের যা নিয়েছ ফেরত দাও' কড়া সুরে বলল ঘোষাল।

আমি জানি না কি ঘটেছে, তবু বললাম, 'শুনুন আপনারা। কথাবার্তা একটু ভদ্রভাবে বলুন। নইলে এরোপ্লেনের মত আওয়াজ তুলে উড়ে চলে যান।'

দু'হাত মুঠো করে সুবল বলল, 'শুনলে, এ মেকুরটা কি বলল? তুমি আবার মুখ খুললে তোমার হাতটা ছিঁড়ে ফেলব।'

একটুও না নড়ে হাসলাম আমি। বললাম, 'আহা, হাত ছিঁড়বে কেন, ছেঁড়ার মত জিনিস কি আর কিছু নেই?'

ঘোষাল সুবলকে বলল, 'থামো সুবল, এ ভদ্রলোক বোধ হয় জানেন না ব্যাপারটা।'

'আমি সত্যি কিছু জানি না। আমার কিছু করার থাকলে বলুন।'

রিমকিকে দেখলাম সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জিজ্ঞেস করলাম, 'চেনো নাকি এ ভদ্রলোকদের?'

'এক বার দেখা হয়েছিল। ক্ষণিকের পরিচয়। এক গ্লাস ধেনোর পরেই যে যার পথে,' বলল রিমকি ধীরকণ্ঠে।

'কিন্তু আমাদের টাকাকড়িও চলে যায় তোমার সঙ্গে,' বলল সুবল।

লোকটার দশাসই চেহারা সত্ত্বেও এটা সহ্য করলাম না। বললাম, 'আপনি ওকে চোর বলছেন?'

'হ্যাঁ, বলছি। তুমি কি করবে?' বলে ঘুরে দাঁড়াল সুবল আমার দিকে।

ভাবলাম, আমি আস্ত থাকলেই রিমকির লাভ হবে। তাছাড়া, নিজের চাইতে দ্বিগুণ বড় আকারের লোকের সঙ্গে লাগতে আমার ভাল লাগে না। তাই বললাম, 'ঠিক আছে দোস্ত। আরে কি হলো, পা-টা আমার শিনশিন করছে কেন?'

'শিনশিন?' বলল সুবল বোকার মত তাকিয়ে।

'হ্যাঁ, শিনশিন করছে। ওরকম হয় আমার। তোমার হয় নাকি রিমকি?'

'আমারও হয়, পিঙ্ক কালারের সালোয়ার পরলে,' বলল রিমকি।

কিছুই বুঝতে না পেরে রাগে ফুঁসতে লাগল সুবল।

'আমার নোটগুলো ফেরত চাই। এত সব কথা শুনতে চাই না। ওগুলো ফেরত নিয়ে এ মেয়েটিকে টুকরো টুকরো করে শকুনকে খাওয়াব।'

ঘোষাল বলল, 'শান্ত হও। রিমকি যে আমাদের টাকা নিয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই আমাদের হাতে।'

'প্রমাণ আমি বের করব। ওকে ন্যাংটো করে হাতড়ে দেখব,' বলল সুবল।

বুঝলাম ব্যাপারটা, রিমকির চোখে ভয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করে। সে এদের পকেট মেরেছে। তবে, তার স্নায়ুর জোর আছে। 'তোমরা কিসের কথা বলছ?' প্রশ্ন করল সে।

'আমরা মনে করি তুমি আমাদের পকেট মেরেছ। দু'জনের পকেটেই টাকা (রুপী) ছিল। তুমি চলে গেলে, টাকাও চলে গেল। আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে চাইনি। তবে টাকাটা তুমি যে নাওনি এটা আমাদেরকে বোঝাতে হবে,' বলল বুড়ো ঘোষাল।

'রিমকি, এ ভদ্রলোকদের টাকা দিয়ে দাও। বল যে ওটা ঠাট্টা করে নিয়েছিলে। ওরা বুঝবে এবং মেনে নেবে আশা করি,' বললাম আমি।

রিমকি একটু দ্বিধা করে তার ব্যাগ থেকে এক তাড়া নোট বের করে ছুঁড়ে দিল টেবিলের ওপর। 'নাও তোমাদের টাকা। বিষ কিনে খাওগে এটা দিয়ে।'

ঘোষাল নোটগুলো তুলে নিল। সুবল বলল, 'আমি এখন ওকে একটা চড় মারব।'

'না, তুমি তা করবে না। নারীর গায়ে আঘাত করা চলবে না,' বলল ঘোষাল।

'অন্তত, প্রকাশ্য স্থানে তো নয়ই,' যোগ দিলাম আমি।

'তাহলে কোন নির্জন স্থানে নিয়ে যাব।'

ঘোষাল টাকা ফেরত পেয়ে খুশি। সে বলল, 'না, ওসব চলবে না। এখন রিমকিকে দু'টি কথা বলি। আমি চাতুর্যের প্রশংসা করি। দারুণ কৌশল দেখিয়েছ বটে। কাজটা নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তোমার ওস্তাদী

অস্বীকার করা যায় না।'

'বক বক কোরো না, বুড়ো প্যাঁচা কোথাকার,' বলল রিমকি নাক ফুলিয়ে।

আহত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ঘোষাল আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে, বাবু?'

'আমার নাম সাগর সোম। দি সিটাডেল পত্রিকার প্রতিনিধি।'

'দিল্লীর সিটাডেল? ওরে বাবা! বড় খুশি হলাম আপনাকে জেনে। তবে দুঃখ হচ্ছে আমাদের দেখাটা এরকম পরিস্থিতে হলো বলে।'

বললাম, 'তাতে কি হয়েছে। রিমকির রসবোধটা একটুখানি বেশি। আমি জানি ঠাট্টা বোঝার ক্ষমতা আপনাদের আছে।'

ঘোষাল বলল, 'শোনো শ্রীমতি রিমকি, তোমার আঙুলগুলো বড়ই চতুর। এগুলো দিয়ে লোকের পকেট না মেরে আরও অনেক চালাকির খেলা দেখাতে পারো।'

'যদি পারি?' বলল রিমকি।

'দেখ মেয়ে, এ ঝগড়াটা ভুলে গেলে আমরা পরস্পরের কাজে লাগতে পারি। তা করতে না চাইলে আমি তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারি। তবে তাতে দু'জনের কারও লাভ হবে না।'

'তোমার এ দামড়াটা থাকতে একত্রে কাজ করা কিভাবে সম্ভব?'

আবার ফোঁস করে উঠল সুবল, 'তোমাকে একা পেলে এমন শিক্ষা দেব যে...'

'সুবলের কথায় কান দিয়ো না। তার মাথাটা একটু গরম। তাকে ক্ষেপিয়ো না। বলো, সহযোগিতা করবে কি করবে না।'

চোখের পাতা কাঁপিয়ে রিমকি বলল, 'অবশ্যই করব। হাত

সাফাইয়ের খেলা দেখতে চাও? সুবল যদি সাহায্য করে এখনি দেখাতে পারি।' চট করে উঠে গিয়ে সে সুবলের এক কান থেকে টেনে লাল রিবন বের করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুবল মাথা সরিয়ে ফেলার আগেই টেবিলের ওপর কয়েক মিটার রিবনের স্তূপ জমে গেল। সুবল দাঁড়িয়ে রইল হা করে।

'ওটা কি আমার কান থেকে বের হয়েছে?' প্রশ্ন করল সে ফিসফিস করে।

রিমকি বলল, 'আমি কিনা ভাবছিলাম যে তোমার মাথাটা ফাঁকা। ওটাকে যে তুমি কাবার্ড বানিয়েছ তা আগে বলনি কেন? করাতের গুঁড়ো বের করব না। কারণ, তোমার মাথাটা চুপসে যাবে। তবে এটা বের করে নিলে তুমি বোধহয় খুশি হবে,' বলেই সুবলের অপর কান থেকে সে একটি পিংপং বল বের করল।

সুবল লাফ দিয়ে উঠে নিজের দু'কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে গুঁতোগুতি শুরু করল।

'স্থির হও সুবল। রিমকি শুধু খেলা দেখাচ্ছে। সে একজন যাদুকর। রিমকি, তুমি সত্যি এক্সপার্ট,' বলল ঘোষাল।

'ম্যাজিক কাকে বলে দেখাতে পারতাম আমার সাজ-সরঞ্জাম থাকলে। এত ছেলেখেলা।'

'ঠিক আছে। এবার শোনো আমার প্রস্তাব। তুমি প্রেতবিদ্যায় বিশ্বাস করো?'

'করি, বাবা,' বলল রিমকি।

আমি বললাম, 'প্রেতবিদ্যা? ওসবে কে বিশ্বাস করে আজকের দিনে?'

'আমার মনে হয় এ রাজ্যটার ইতিবৃত্ত আপনি জানেন না,' বলল ডাক্তার ঘোষাল। 'আমি এখানে অনেকদিন আছি, অনেক ঘোরাঘুরি করেছি, অনেক অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করেছি। এক সময় এখানে নাংখ্রা নামে এক শক্তিশালী গোপন সমিতি ছিল। এর সদস্যরা ছিল প্রেতবিদ্যার পুরোহিত। তারা পাহাড়ীদের ওপর প্রভুত্ব করত। এখন তারা প্রায় বিলুপ্ত। তবে এখান থেকে দূরে, আঠারো মুড়ার পাহাড়ী এক গাঁয়ে প্রেতবিদ্যার চর্চা আজও হয়।'

'ওদের কথা শুনেছি। মুহূর্তের মধ্যে নাকি ওরা বৃষ্টি নামাতে পারে, পশুর রূপ ধারণ করতে পারে। ওসব গাঁজাখোরি গল্প আপনি বিশ্বাস করেন?' বললাম ঘোষালকে।

ঘোষাল জবাব দিল, 'না, করি না। তবে বিশ্বাস করি যে তাদের কিছু অলৌকিক শক্তি আছে। তারা গণ-সম্মোহন জানে। আমাদের আগ্রহ ওসব বিষয়ে নয়। আমার আগ্রহ তাদের ভেষজ অষুধের ব্যাপারে। মাংতালির নাম শুনেছেন?'

'ওটা কি? মদ-টদ নাকি?' প্রশ্ন করলাম।

'না, সাপে কাটার অষুধ। একেবারে ধন্বন্তরি। সাপের কামড়ে মানুষের মৃত্যু দেখেছি। বীভৎস দৃশ্য। কিন্তু ওই পাহাড়ী গ্রামে দেখেছি ওঝারা জঙ্গল থেকে সদ্য ধরে আনা গোখরো সাপের কামড় খাচ্ছে, তারপরে একটা মলম লেপে দিচ্ছে দংশিত স্থানে। তাদের কিছুই হচ্ছে না।'

'হয়তো এটা দেখানোর আগে ওরা সাপগুলোর বিষ দোহন করে নিয়েছিল?'

'না। আমি তাদেরকে কড়া পরীক্ষা করেছি,' বলল ঘোষাল।

'চন্দ্রবোড়া, কাল কেউটে, শঙ্খচূড়, কাঁকড়া বিছা, গোখরা সবার বিষ ব্যর্থ মাংতালির কাছে।'

'মাংতালি।'

'ঠিক আছে, আপনি এখন কি করতে চান?'

'আমি ওই রাংখল ওঝা,' মানে সর্দার গুণীনের কাছ থেকে অষুধটা বানানোর ফর্মুলা জানতে চাই এবং রিমকি বেটি ইচ্ছা করলে ওটা আনতে পারে।'

রিমকি বলল, 'তোমার চাঁদিটাও গরম হয়ে গেল নাকি বাবুজি?'

আহত দৃষ্টিতে তাকাল ঘোষাল রিমকির দিকে। আমি বললাম, 'রিমকি কিভাবে ফর্মুলাটা আনবে? আপনিই বা কি করবেন ওটা দিয়ে?'

'ভারতে এবং সারা দুনিয়ায় সাপের কামড়ে মানুষ মরে। মাংতালি বানিয়ে ঠিক মত বাজারজাত করতে পারলে আমরা কোটি কোটি রূপীর মালিক হয়ে যাব।'

আমি ভাবলাম কথাটা সত্যও হতে পারে এবং খবর বা নিউজ হিসাবেও এটা দারুণ হবে।

'আপনি ব্যাপারটা নিজে দেখেছেন?'

'নিশ্চয়ই।'

'তাহলে নিজে চেষ্টা করেননি কেন?'

'পনেরো বছর ধরে লেগে আছি। মুংখ্রা ব্যাটা দেয় না। শয়তান বুড়োটা কেবল হাসে।'

রিমকি বলল, 'আমার কি করার আছে এখানে?'

'দু'সপ্তাহ আগে দেখা করেছি মুংখ্রার সঙ্গে। সে এড়াতে চায় বরাবরের মত। শেষে চেপে ধরি তাকে। তখন বলে যে সহসা সে মারা

যাবে। মরার আগে এক সূর্যকুমারী, সূর্যদেবতার কন্যা এসে তার সব গোপন বিদ্যা নিয়ে যাবে। ওই কুমারীর থাকবে বিরাট যাদুক্ষমতা। তার রূপ হবে দেবীর মত। রিমকি মাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে মুংখ্রার পেট থেকে কথা বের করা যাবে।'

সোজা হয়ে বসল রিমকি। 'তুমি চাও সূর্যকুমারী সেজে আমি মুংখ্রার কাছে যাই, তা-ই না?'

'কেন নয়? তুমি যেসব ম্যাজিক জানো, তোমার যা রূপ আর কথার বাহাদুরি, তুমি ওটা সহজেই পারবে।'

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় এ গ্রামটি, ডাক্তার?'

'আঠারো মুড়ার কাছে।'

'দেখুন ডাক্তার, আমাকে আর রিমকিকে বিষয়টা নিয়ে একটু কথা বলতে দিন।'

'আধ ঘণ্টা সময় দিলাম। দেখবেন, পালিয়ে যাবেন না যেন,' বলে ঘোষাল দাঁড়াল। সুবল ও উঠল চেয়ার ছেড়ে। রাগে গরগর করছে সে। রিমকিকে সাজা দিতে পারেনি বলে।

সূর্যকুমারী হবার প্রস্তাবটা লোভনীয় তাই না?' বললাম চেয়ারে হেলান দিয়ে। রিমকি যে জবাবটা দিল তা ছাপার যোগ্য নয়।

পাঁচ

আমি তাকে রাজি করালাম। তাকে বোঝালাম যে রাজি না হলে বুড়ো ঘোষাল তাকে পুলিশে দেবে। রাজি হয়ে দিন দু'য়েক কাজ করলে লাভের ভাগ সেও পাবে।

স্থির হলো আমরা চারজন ওই হোটেলেই থাকব। তিনটা রুম নিলাম। একটাতে আমি, একটাতে রিমকি, একটাতে ঘোষাল আর সুবল। নিজের রুমে গিয়ে দিল্লীতে কল্ বুক করলাম। লাইন পেয়েই প্যাটেল সাহেবকে বললাম মেয়েটিকে পেয়ে গেছি। শুনে থতমত খেয়ে গেলেন তিনি। মনে হলো খবরটার জন্য তিনি প্রস্তুত নন এবং এখনি মেয়েটাকে আমি হাজির করি তা-ও চান না। তাছাড়া, তিনি মেয়েটির দস্যু কর্তৃক অপহৃত হবার গল্পটি আঁকড়ে থাকতে চান। ত্রিশজন দস্যু এসে হোটেল থেকে তাকে তুলে নিয়ে যায় এই হবে তাঁর কাহিনী।

তাঁকে বললাম, ওসব হবে, চিন্তার কারণ নেই। তিনি খুশিতে গদগদ হলেন।

ঘটনাটা ঘটানো হবে এভাবে: আমি রিমকিকে নিয়ে যাব আঠারো মুড়ায়। সাপে কাটার অষুধের ব্যাপারটা সেরে ফেলব। সেখান থেকে ফেরার পথে রিমকিকে অপহরণ করবে একদল উপজাতীয় লোক। এক

পাহাড়ীগুণ্ডাকে জানি। হাজার দু'য়েক রুপী পেলেই খুশি হয়ে কাজটা করবে। আমি অপহরণের কয়েকটি ফটো তুলব। তারপর হবে একটা উদ্ধার অভিযানের সাজানো নাটক। বাকিটা হবে জলবততরলং। সব কাজ এক সপ্তাহে শেষ।

প্যাটেল সাহেব পছন্দ করলেন আইডিয়াটা। সর্পদংশনের অষুধের কথাটা শুনে উত্তেজিত হলেন এবং বললেন ওই কারবারে তিনিও অংশীদার হবেন। নিরুৎসাহিত করলাম না। তবে মনে মনে ভাবলাম সাপের অষুধের কারবারটা যদি জমে তবে আমার তাতে একটা শেয়ার থাকতেই হবে। তাঁকে বললাম আমাকে যুক্তিসঙ্গত খরচের অনুমতি দিতে হবে। তিনি রাজি হলেন।

এরপরে চললাম রিমকির সঙ্গে আলাপ করতে। তাকে আরেকটু ভাল করে জানা দরকার। দেখলাম সে রুমে নেই। বাইরে তার গাড়ি নিয়ে কি যেন করছে।

'চলো না ওই পাহাড়গুলোর দিকে। একটু হাওয়া লাগুক গায়ে,' বললাম তাকে।

নীরবে গাড়িতে উঠল সে। আমি বসলাম পাশে। গাড়ি চলল। পাহাড়শ্রেণীর কাছে গিয়ে সে বলল, 'আমরা নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারি উদয়পুরের দিকে। তারপর বিদায় নিতে পারি একে অন্যের কাছ থেকে।

'সাপের অষুধের কি হবে?'

'তুমি সত্যি বিশ্বাস করো ওসবে?'

'মনে হয় করি। তাছাড়া ঘোষালকে তুমি কথা দিয়েছ।'

সে বলল, 'কথা না কচু।'

'বেঈমানি করবে লোকটার সঙ্গে?'

'আরে ভুলে যাও ওই বুড়োর কথা। আমি কারও হুকুমে চলি না। বলছি এখান থেকে চলে যাব। ফিরব না হোটেলে।'

হঠাৎ গাড়ি থামাল সে। নেমে গিয়ে উঠতে লাগল ছোট্ট সুন্দর এক পাহাড়ে। আমি অনুসরণ করলাম।

'শোনো দিদিমনি...' বললাম তাকে।

'ওসব দিদি-টিদি বাদ দাও। আমার একটা নাম আছে, রিমকি সামন্ত, মনে নেই? আমাকে এই গ্যাঞ্জাম থেকে বেরিয়ে যেতে দাও!'

মনে মনে ভাবলাম গ্যাঞ্জামের কি দেখেছ খুকি? তোমাকে নিয়ে আমার যা পরিকল্পনা সেটা জানলে এখনি গাছে উঠতে চাইবে। মুখে বললাম, 'তুমি কি রাংখল গুণীন মুংখ্রার ভয়ে পালাতে চাচ্ছ?'

'ভয় আমি দু'পেয়ে কাউকে করি না। কিন্তু এটা পাগলের পরিকল্পনা। আমি ওদের ভাষা জানি না। ওরা টের পেয়ে যাবে যে আমি ভুয়া।'

'ওসব নিয়ে ভেব না। ডাক্তার সব দেখবে।'

পাহাড় চূড়ায় ঘাসের ওপর শুয়ে অনেক কথা বললাম দু'জনে। উপলব্ধি করলাম বন্ধুত্বের একটা সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মধ্যে।

ফিরে আসার সময় সে প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, ঘোষালের প্রস্তাব মত কাজ করতে যে বলছ এর পেছনে তোমার স্বার্থটা কি?'

'আমার স্বার্থ একটা নিউজ স্টোরী। একটা ভাল কাহিনীর চাহিদা ও মূল্য একমাত্র সাংবাদিকরাই জানে। তাছাড়া, তুমি সফল হলে অধুষ বিক্রির পয়সা থেকে একটা অংশ তো পাবই।

গাড়িতে বসে বললাম, 'রিমকি, এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরেই ছবির মত সুন্দর শহর বিশ্রামগঞ্জ। যাবে ওখানে? দুটো বীয়ার

খেয়েই চলে আসব।'

রিমকি হেসে মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বিশ্রামগঞ্জে পৌঁছতে দেরি হলো না। একটা ছোট রেস্তোরাঁয় বসে অর্ডার দিলাম বীয়ারের। একটু পরেই আমার চোখ পড়ল দরজার দিকে। প্রায় ছয় ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা এবং অসম্ভব মোটা এক টিপরা দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে। পরনে কালো প্যান্ট, গায়ে হলুদ জ্যাকেট। মুখে সিগারেট। বড় বড় কালো চোখে জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে রিমকির দিকে। চোখ দু'টি সাপের চোখের মত। বুঝলাম, এ সহজ পাত্র নয়।

রিমকিও লক্ষ্য করল লোকটাকে। বলল, 'এ হয়তো জমজ হয়ে জন্মেছিল। এর মা অতি গরম পানিতে স্নান করানোর সময় যমজ দুটো জোড়া লেগে যায়।'

আমি বললাম, 'সাবধান রিমকি, তোমার ওসব রসিকতা আমার জন্য রেখে দাও। এ মালটির হজম হবে না।'

দৈত্যাকার লোকটি মুখের সিগারেটটা দু'আঙ্গুলে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল আমাদের দিকে। জ্বলন্ত সিগারেটটা এসে পড়ল দু'জনের মাঝখানে টেবিলের ওপর। অন্য কেউ এরকম করলে তার কানটা মুচড়ে দিতাম। কিন্তু আগেই বলেছি যে আমার একটা কুসংস্কার আছে। নিজের চাইতে দু'তিন গুণ আকারের কাউকে আমি ঘাঁটাই না।

রিমকি উস্কাতে চাইল আমাকে, 'লাগাওনা একটা ঘুষি ওর পেটটায়।'

'আত্মহত্যা করতে বলছ?'

'ওই চর্বির পিণ্ডটা আমাকে অপমান করবে, আর তুমি কেবল দেখবে?'

'এটা তুচ্ছ ব্যাপার, চেপে যাও।'

এ সময় বয়টা এসে দুই গ্লাস বীয়াব দিল আমাদেরকে। মোটা লোকটির মুখে তখন আরেকটি সিগারেট। মুখ থেকে ওটা নিয়ে সে আগের মত ছুঁড়ল আমাদের দিকে। সিগারেটটা উড়ে এসে পড়ল রিমকির গ্লাসে। আমি চট্ করে আমার গ্লাসটা তাকে দিয়ে বললাম কোন মন্তব্য না করতে।

রিমকির মুখটা লাল হয়ে গেল। চোখ দুটো জ্বলে উঠল বেড়ালের চোখের মত। লোকটি হেসে উঠল হো-হো করে। বলল, 'তোর মুখটা খুব বড়। চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিস। হুঁশিয়ার হয়ে যা।'

লোকটা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল রিমকির দিকে। রিমকির হাত দুটো টেবিলে রাখা। জোড়া তালুর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ছোট্ট সবুজ রঙের সাপ। সাপটি শাবল আকৃতির মাথা উঁচু করেছে ছোবল মারার ভঙ্গিতে। লম্বা চেরা জিহ্বাটি বের করছে ঘনঘন। তারপরেই রিমকি হাতের তালু খুলল। সাপটা অদৃশ্য হয়ে গেল। সে হাসল মোটা লোকটির দিকে চেয়ে, যেন তারা পুরানো বন্ধু।

লোকটার চেহারা তখন দেখবার মত। এক মিনিট আগেই তার কি চোটপাট! পর মুহূর্তে চোপসানো বেলুন। চোখে হাত চাপা দিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছে।

'কেটে পড় বন্ধু, যত শিগগির পারো,' বলল রিমকি।

একটা টিপ্‌রা বয় ছুটে এসে ফিসফিস করে কি যেন বলল লোকটিকে। লোকটি চমকে উঠে তাকাল রাস্তার দিকে। তারপর রোষদৃষ্টি হেনে রিমকিকে বলল, 'আবার দেখা হবে তোর সঙ্গে। তোর মুখে জ্যান্ত ভিমরুল ঢুকিয়ে ঠোঁট দুটো সেলাই করে দেব।' পর মুহূর্তে

চলে গেল সে।

রিমকিকে বললাম, 'চলো, আমরাও কেটে পড়ি। কিছু একটা গোলমাল হবে মনে হচ্ছে।'

আমরা গাড়ির কাছে যেতে না যেতেই সেখানে ছুটে এল একদল পুলিশ। পিস্তল উঁচিয়ে অফিসারটি জিজ্ঞেস করল আমরা কোন মোটাসোটা লোক দেখেছি কি না। বললাম, 'কই, কাউকে দেখিনি তো।'

'আমরা খবর পেলাম পাঁচ মিনিট আগেও সে এখানে ছিল।'

'পাঁচ মিনিটে অনেক কিছুই ঘটে যেতে পারে। লোকটা কে?'

জবাব না দিয়ে অফিসারটি চলে গেল দলবল নিয়ে।

'কাউকে দেখনি বললে কেন? ওই লোকটার ভয়ে?' প্রশ্ন করল রিমকি।

বললাম, 'ভয়ের কথা নয়। এখানে অনেক ভয়ঙ্কর লোক আছে। তাদের ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয়।'

গাড়ি ফিরে চলল বিশালগড়ের দিকে। রিমকি হাসতে হাসতে বলল, 'সাপের ট্রিকটা দেখে ওর চেহারা কেমন হয়েছিল লক্ষ্য করেছ?'

'করেছি এবং শেষে কি বলে গেছে তা-ও শুনেছি।'

'ও যা বলেছে তাই করবে বলে বিশ্বাস করো?'

'এরকম লোকরা সব পারে। পরে দেখা হলে আগে ওকে গুলি করব, গুলি করে দুঃখ প্রকাশ করব।'

হোটেলে ফিরতেই সুবল জিজ্ঞেস করল আমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলাম। ডাক্তার খুব চিন্তায় পড়ে গেছে।

ছয়

পরবর্তী দুই দিন কাটল খুব ব্যস্ততার মধ্যে। আমরা সিদ্ধান্ত করেছি যে পুরান আগরতলা হয়ে আঠারো মুড়ায় কাছে পাহাড়ী গাঁয়ের গুণীন মুংখ্রার কাছে যাব আগামী বৃহস্পতিবার। মাঝখানে সময় মাত্র তিন দিন। এরিমধ্যে অনেক কাজ সারতে হবে। রিমকিকে সূর্যকন্যা সাজাবার জন্য পোশাক কিনতে হবে। চলে গেলাম আগরতলা। সবচেয়ে বড় ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে খুঁজে পেলাম একটা সাদা সিল্কের শাড়ি। সোনালী জরির পাড়। রিমকি দারুণ খুশি। যাদু দেখাবার সময় সে মাথায় একটা শোলার জরির কাজ করা মুকুট পরত। শাড়ি আর মুকুট পরিয়ে দেখা গেল যে তাকে সত্যি একজন দেবকন্যার মত লাগছে। মুংখ্রা থ' খেয়ে যাবে তাকে দেখে, এতে সন্দেহ নেই।

কয়েকটি ম্যাজিকের বাছাই করা ট্রিক মহড়া করে নিল সে। আমি অপহরণের ব্যাপারটি নিয়ে ব্যস্ত হলাম।

কাজটা সহজ নয়। ঘোষাল আর সুবলকে কিছু জানানো যাবে না। যে রিয়াং গুণ্ডাকে জানতাম খোঁজাখুঁজি করে পেলাম তাকে। তার নাম প্রতাপ রিয়াং। ছোটখাট ছিনতাই-ডাকাতি করে, তবে খুব বদমাশ নয়। সহজ-সরল, বিশ্বাস করা যায়। তার কাজ হবে পুরান আগরতলার যে

হোটেলটাতে আমরা উঠব সেখান থেকে রিমকিকে তুলে নিয়ে যাওয়া। কাজটা করবে রিমকি আঠারো মুডার গুণীন মুংখ্রার গ্রাম থেকে ফিরে আসার পরে। প্রতাপ রিয়াং নেচে উঠল আইডিয়াটা শুনে। তাকে বললাম কাজটা কখন করতে হবে সেটা তাকে জানাব। আগাম দিলাম পাঁচশো। কাজ হয়ে গেলে আরও দেড় হাজার দেয়া হবে।

সব ঠিকঠাক। পুরান আগরতলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করব। এমন সময় একটা অঘটন ঘটল। ডাক পিওন এসে একটা টেলিগ্রাম তুলে দিল আমার হাতে। দিল্লী থেকে চীফ রিপোর্টার মি. শেঠ-এর জরুরী বার্তা। মিজোরামে লালডেঙ্গার গেরিলারা আবার গণ্ডগোল পাকিয়ে তুলেছে। ছয়জন পুলিশের মাথা কেটে নিয়েছে। আইজলে মোতায়েন সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো রওয়ানা হয়েছে তাদের শায়েস্তা করার জন্য। আমাকে ওখানে যেতে হবে। সেনাবাহিনীর তৎপরতার ওপর রিপোর্ট পাঠাতে হবে।

সব শুনে ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'অসম্ভব! এ সময় আপনার যাওয়া চলবে না। আমি সব কিছু ঠিক করে ফেলেছি মুংখ্রার সঙ্গে। বলেছি আমরা আসব।'

'দুঃখিত। অন্তত দিন কয়েকের জন্য আমাকে যেতে হবে। আপনি নিয়ে যান রিমকিকে। মুংখ্রার ওখান থেকে ফিরে পুরান আগরতলায় অপেক্ষা করবেন আমার জন্য।'

রিমকি বলল, 'তুমি আমাকে ফেলে শেষ পর্যন্ত কেটে পড়ছ?'

বললাম, 'ভাবনার কিছু নেই। ডাক্তার আছেন। অপেক্ষা কোরো আমার জন্য। আমি ফিরে আসবই।'

'ঠিক আছে, কেটে পড়। আমি পরোয়া করি না,' বলেই গাড়ি স্টার্ট

দিল সে।

মিজোরামে সেনাবাহিনীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। পাহাড়ে-জঙ্গলে অনেক ঘুরেও তারা নাগাল পায়নি গেরিলাদের। আমি দিন কয়েক ওদের সাথে ঘুরে কিছু ফটো তুলে ফিরে এলাম মিজোরাম থেকে। পুরান আগরতলায় পৌঁছে দেখলাম ঘোষাল আর সুবল হোটেলের সামনে এক গাছতলায় বসে আছে মুখ গোমড়া করে। রিমকি নেই।

রিমকি কোথায়, এ প্রশ্নের জবাবে ঘোষাল বলল যে তাকে মুংখ্রা আর তার রাংখল চেলারা আটকে রেখেছে। দোষটা রিমকির। সে একের পর এক যাদুর খেলা দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় ওই বুনো লোকদের। ওরা বিশ্বাস করে বসে যে সে সত্যি সূর্যকন্যার অবতার, সাক্ষাৎ দেবী। দেবীকে ওরা ছাড়বে না। রেখে দেবে এবং পূজা করবে। ঘোষালরা নিয়ে আসতে চাইলে ওরা রুখে দাঁড়ায়।

'ইয়া বড় বড় "তাক্কল" (রামদা) নিয়ে তেড়ে আসে রাংখলরা!' বলে সুবল।

'আমাদের রাজ্য পুলিশের কাছে যাওয়া উচিত,' বললেন ডাক্তার।

'পুলিশকে নড়াতে এক মাস লেগে যাবে, ততদিন মেয়েটা ওখানে বন্দী হয়ে থাকবে? না, আমি কিছু অস্ত্র জোগাড় করব যেভাবে পারি। আমাদেরকেই যেতে হবে তার উদ্ধারে,' বললাম দৃঢ়তার সাথে।

'আমরা তো মাত্র তিনজন,' বলল সুবল মিনমিন করে।

'তিনজনই যথেষ্ট। তোমরা ঘোড়া জোগাড় করো। আমি অস্ত্রের খোঁজে যাই।'

হোটেলের উপজাতীয় মালিককে খুঁজে বের করলাম। বললাম বিপদে পড়েছি। কিছু অস্ত্র চাই। জোগাড় করা যাবে? অবশ্য ভাড়া

দেব।

হাসতে গিয়ে বোতামের মত ছোট চোখ দু'টি প্রায় বন্ধ করে লোকটি বলল যে জোগাড় হবে। বিদ্রোহী উপজাতীয় যুব সমিতির এক মস্তান তার পরিচিত। তাকে খবর পাঠালে আধঘণ্টার মধ্যে অস্ত্র চলে আসবে।

ঘোড়া আর অস্ত্র জোগাড় হলো। তিনটা কাটা রাইফেল আর তিনটা ·৩৮ অটোমেটিক নিয়ে রওয়ানা হলাম। উপত্যকার পর উপত্যকা, পাহাড়-জঙ্গল ভেদ করে চললাম কয়েক ঘণ্টা। অবশেষে পৌঁছলাম আঠারো মুড়া পাহাড়শ্রেণীর গায়ে এক ছোট্ট উপজাতীয় গ্রামে। কিন্তু গ্রামটি একেবারেই জনশূন্য।

'কেউ নেই। শিকার টিকারে চলে গেছে নাকি?' বললেন ঘোষাল।

'রিমকিকে আপনি খুঁজে বের করুন। অন্য কোন কথা শুনতে চাই না।'

'মুংখ্রার আরেকটি আস্তানা আছে, জঙ্গলের গভীরে,' বলে ঘোষাল ঘোড়া হাঁকড়ালেন সামনের দিকে।

আরও কিছুদূর যেতেই এক ঘন বনের মধ্যে পাথরে তৈরি একটা ছোট্ট কুটির দেখা গেল।

ঘোষাল নামলেন ঘোড়া ছেড়ে। আমিও নেমে চলে গেলাম কুটিরের জীর্ণ কাঠের দরজার সামনে। ধাক্কা দিলাম। কোন সাড়াশব্দ পেলাম না।

'কেউ নেই এখানে। ওরা রিমকিকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে,' বললাম।

সুবল বলল, 'ঘোড়া-পচা গন্ধ পাচ্ছি যেন।'

'মুখ বন্ধ রাখো সুবল। দরজায় তালা নেই। ভেতর থেকে বন্ধ

করা। ধাক্কা লাগাও।'

সুবল কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আড়াই মনী ওজনের ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ এসে আঘাত হানল আমাদের নাকে। আমরা লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেলাম। পেট গুলিয়ে উঠল তিন জনের।

'কেউ একজন মরে পড়ে আছে ভিতরে অনেকক্ষণ ধরে।'

'রিমকি নয় তো?' প্রশ্ন করলাম ঘোষালকে। তাঁকে ঠেলে সরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভিতরে। নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম মুখ হা করে। অন্ধকারটা চোখ-সহা হয়ে উঠতেই লক্ষ্য করলাম নোংরা কম্বল গায়ে জড়িয়ে কেউ বসে আছে দেয়ালে পিঠ দিয়ে। মুংখ্রাই বটে। তার পচা ফোলা মুখে আর মাথায় কিলবিল করছে অসংখ্য কীট।

হাতের জ্বলন্ত ম্যাচ-কাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে ঝড়ের বেগে ফিরে এলাম দরজায়। হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, 'মুংখ্রা মারা গেছে। কিন্তু রিমকি কোথায়?'

'ডান দিকে আরেকটি কামরা আছে, ওখানে দেখুন,' বললেন ঘোষাল।

আরেকটা ম্যাচের কাঠি জ্বালালাম। রুমের শেষ প্রান্তে অন্ধকার একটা দরজার মত নজরে পড়ল। এগিয়ে গেলাম সেদিকে। ঘোষাল আমার পেছনে। জ্বলন্ত কাঠি হাতে তাকালাম সামনে। দরজার মুখেই নিবে গেল কাঠিটা। ডুবে গেলাম অন্ধকারে। মনে হলো চারদিক থেকে অসংখ্য ভৌতিক বস্তু হামাগুড়ি দিয়ে আসছে আমার কাছে। একা হলে মূর্ছা যেতাম। ঘুরে গিয়ে পালাতাম বাইরের আলোর মধ্যে। ওই বিভীষিকাময় অন্ধকারে আবার যেতাম না। পিছনে ঘোষাল থাকায়,

গায়ে তাঁর স্পর্শ লাগায়, দাঁড়িয়ে রইলাম।

'কিছু শুনতে পাচ্ছেন?' ফিসফিসিয়ে বললেন তিনি।

শোনার চেষ্টা করলাম। সম্পূর্ণ নীরবতা। নিজের বুকের ধুপধুপ শব্দ আর ঘোষালের নিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই কানে এল না। আরেকটি ম্যাচ কাঠি জ্বাললাম। ওটাও নিবে গেল। কিন্তু নিবে যাবার মুহূর্তে বহু দিনের ক্ষুধার্ত একটি ছায়া মূর্তিকে সরে যেতে দেখলাম আলোর বৃত্ত থেকে। সরে গেল নিঃশব্দে, ভয়ার্তভাবে। কাঁটা দিয়ে উঠল আমার সারা গা।

'কেউ একজন আছে এখানে। ডাক্তার, আপনি কোথায়?'

'আপনার ঠিক পিছনে। ওটা কে?'

'জানি না।' হাত ঠকঠক করে কাঁপছে। কাঠি বের করতে না পেরে ম্যাচ বাক্সটা দিলাম ঘোষালকে। 'কেউ একজন বা কিছু একটা আছে এখানে।'

'কোন জন্তুটন্তু?' কাঁপা স্বরে ঘোষালের প্রশ্ন।

'জানি না।' ·৩৮ পিস্তলটা বের করলাম পকেট থেকে।

আবার জ্বলল ম্যাচের কাঠি। মুহূর্তের জন্য আলোকিত হলো রুমটা। দেখলাম রিমকি শুয়ে আছে খড়ের বিছানায়। চোখ বন্ধ। দেহ স্থির। তার মাথার ওপরটায় কালো এবং আকারহীন কিছু একটা নড়াচড়া করছে। কিন্তু আমি এগিয়ে যেতেই ওটা মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

'কাঠিটা আরও উঁচিয়ে ধরুন,' বললাম ঘোষালকে।

এবার দেখলাম যে আমরা আর রিমকি ছাড়া আর কেউ নেই রুমে।

এক পলকে রিমকিকে যা দেখলাম ভুলব না জীবনে। সাদা ঝলমলে শাড়ি পরে শুয়ে আছে। চুলের গোছা কাঁধের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে আছে দু'পাশে। মুখটি উত্তোলিত সেই পাথুরে কুটিরের ছাদের দিকে। তাকে

দেখাচ্ছে এক সুন্দর দেবীমূর্তির মত। কিন্তু এসব সৌন্দর্য বিচারের সময় নয় এখন। ভয় আমার ভেতরটা কুরে কুরে খাচ্ছে।

ঘোষালের হাত চেপে ধরে বললাম, 'কেউ একজন ছিল এখানে। আমি জানি, ছিল। এখন গেল কোথায়? কাঠিটা আরও তুলে ধরুন।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ঘোষাল ঝুঁকে দাঁড়ালেন রিমকির দিকে। বললেন আচ্ছন্নের মত, 'সে ঘুমিয়ে আছে! ঘুমিয়ে আছে এই দুর্গন্ধের মধ্যে!'

আমি ঠেলে সরিয়ে দিলাম তাঁকে। মাথার নিচে হাত দিয়ে ঠেলে বসার ভঙ্গিতে আনলাম। পাঁজাকোলা করে তুলে নিলাম খড়ের বিছানা থেকে। তোলার সময় এমন একটা ব্যাপার ঘটল যা জীবনে ভুলবার মত নয়। এখনও মনে হলে আমার শরীরে ঘাম দেখা দেয়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

আমি তাকে তুলে নিচ্ছি এমন সময় কিছু একটা বা কেউ একজন যেন ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল আমার হাত থেকে, রিমকি যেন হঠাৎ পাথরের মত ভারী হয়ে গেল। আমি যেন তাকে বইতে পারছি না। কে যেন লম্বা লম্বা হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরল আমার দু'পায়ের গোড়ালি। অতি জোর করে, অতি কষ্টে পৌঁছলাম দরজার মুখে। চিৎকার করে সুবলকে বললাম ঘোড়া নিয়ে আসতে।

রিমকিকে তুলে দিলাম সুবলের হাতে। লাফিয়ে উঠলাম ঘোড়ার পিঠে। সুবল তাকে তুলে দিল জিনের ওপর। লাথি মেরে ঘোড়াকে ছুটালাম সামনের দিকে। ঘোষাল আর সুবল ও আসতে লাগল আমার পিছনে। রাংখলদের গ্রামটা ছাড়িয়ে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে ঘোড়া থামিয়ে নামলাম। রিমকিকে শুইয়ে দিলাম এক গাছের ছায়ায়।

ডাক্তারকে বললাম, 'দেখুন তো ওকে।'

ঘোষাল নাড়ি টিপে, চোখের পাতা উল্টে দেখে উবু হয়ে বসে বললেন, 'মেয়েটা ঘোরের মধ্যে আছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিছানায় শোয়াতে হবে। এখানে কিছু করা যাবে না। অবস্থা পুরোপুরি স্বাভাবিক। নাড়ির স্পন্দন ভাল, নিশ্বাস নিয়মিত।'

'কি হচ্ছিল ওখানে? ওর এ অবস্থা হলো কেন?' জানতে চাইলাম।

ঘোষাল দাঁড়িয়ে বলল, 'এখানে কথা বলে লাভ নেই। চলুন পুরান আগরতলায়।'

'রিমকি এত দীর্ঘপথ যাবার ধকল সইতে পারবে তো?'

'ঘাবড়াবেন না। ওর কিছু হয়নি। সম্মোহনের ঘোরের মধ্যে আছে। ঘণ্টা কয়েক পরেই জেগে উঠবে।'

আমরা পৌঁছলাম গন্তব্যস্থলে। রিমকি তখনও সংজ্ঞাহীন।

হোটেল মালিকের বৌ এসে বলল, 'নিয়ে আসুন তাড়াতাড়ি। বিছানা তৈরি আছে।'

রিমকিকে বিছানায় শুইয়ে ঘোষাল আর হোটেলওয়ালার বৌ-এর জিম্মায় ছেড়ে নিচে নেমে বারান্দায় বসলাম এক মগ বীয়ার নিয়ে। সুবল এসে জুটল। উদ্বেগের সুরে বলল, 'মেয়েটির কিছু হবে না তো?'

'মনে হয় সেরে উঠবে।'

'কি দেখেছিলে ওই ঘরটার মধ্যে?'

'জানি না। আমি ওসব ভাবতে চাই না।'

একটু দ্বিধা করে আবার প্রশ্ন করল সুবল, 'ডাক্তার যে প্রেতবিদ্যা, যাদুটোনার কথা বলছিল ওসব তুমি বিশ্বাস করো?'

'ধুর, না!'

একথা শুনে দেখলাম আশ্বস্ত হলো সুবল। বলল, 'ভাল কথা, সাপের বিষের অষুধ বানানোর গোপন ফর্মুলা এনেছে রিমকি?'

কথাটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল যে আগামী কাল প্রতাপ রিয়াং আসবে পাহাড় থেকে। রিমকিকে অপহরণের ব্যাপারটা নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনার জন্য। রিমকির এ অবস্থায় অপহরণ নাটক অসম্ভব। কিন্তু সেটা ছাড়া এক লাখ রুপী পুরস্কার পাব কেমন করে? চাকরিটাও যেতে পারে। কি গ্যাঁড়াকলেই না পড়ে গেলাম হঠাৎ।

ঘোষাল এসে বললেন, 'চিন্তিত হবার কারণ নেই। ঘণ্টাকয়েকের মধ্যেই সুস্থ হয়ে যাবে। কিন্তু মুংখ্রা কিভাবে মরল বুঝতে পারছি না।'

'তার কথা ভাবতে চাই না। কবে থেকে মরে পড়েছিল মনে হয় আপনার?'

'ওই গরমে বদ্ধ ঘরে একদিনেই লাশে পচন শুরু হতে পারে।'

'বুঝতে পারেন যে এ ঘটনা মেয়েটির মনের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে? আমরা বড় ক্ষতি করে ফেলাম ওর। বীভৎস নোংরা কি একটা জিনিস ছিল ওই ঘরে। আমি শপথ করে বলতে পারি কাউকে দেখেছি ঘরটায় ঢোকার পর।'

'ম্যাচের কাঠির আলোয় অনেক কিছু দেখার কল্পনা করা যায়। আমি রিমকি ছাড়া আর কাউকে দেখেনি।'

ক্রুদ্ধ হয়ে বললাম, 'ব্যাখ্যা দিচ্ছি না, সোজা বলছি। আমার এসব পছন্দ হচ্ছে না। যা বুঝি না এমন ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি আমরা।'

'ওভাবে কথা বলছেন কেন?' আপত্তি করলেন ঘোষাল অন্য দিকে চোখ সরিয়ে।

'কারণ, আপনি মিথ্যে বলছেন, ডাক্তার। ভয় আপনিও পেয়েছেন।

কেবল স্বীকার করছেন না সাহস নেই বলে। কিছু একটা ঘটেছে ওই ঘরে, যাতে মুংখ্রা বুড়ো মরেছে। কোন প্রেতশক্তি ছাড়া পেয়েছে। ওটাই আমার কাছ থেকে রিমকিকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছে। ঘোড়ার পিঠ থেকে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছে।'

সুবলের চোখ দু'টি কপাল থেকে ঠিকরে বেরিয়ে আসার উপক্রম হলো। সোজা হয়ে বসে বলল, 'প্রেতশক্তি! কি বলছ তুমি!'

'জানি না,' বলে চলে গেলাম রিমকির ঘরে। একটা চেয়ার টেনে বসলাম খাটের পাশে। সে চোখ খুলল অলস ভঙ্গিতে। বলল, 'তুমি এখানে কি করছ? আমার কি অসুখ হয়েছে? আমি কোথায়?'

'উত্তেজিত হয়ো না। আমরা তোমাকে নিয়ে এসেছি মুংখ্রার ওখান থেকে।'

'নিয়ে এসেছ? আমি জাগিনি কেন?'

'তুমি ঘুমিয়ে ছিলে। জাগাতে পারিনি। বলো তো কি হয়েছিল?'

'কিচ্ছু হয়নি তো? আসলে আমার কিছু মনে পড়ছে না। বুড়ো গুণীনটা আমাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। আমার যাদু তাকে মুগ্ধ করে। একের পর এক ট্রিক দেখিয়ে তাকে অবাক করে দি। সে তখন আমাকে একটা পাথরের বাড়িতে নিয়ে যায়। আমাকে সেখানে একা রেখে কোথায় চলে যায়। আমার খুব খারাপ লাগে। আমি শুয়ে পড়ি খড়ের ওপর। তারপরে কি হয়েছে জানি না।'

'তুমি দুই দিন ঘুমিয়েছিলে,' বললাম তাকে।

'দুই দিন! পাগল নাকি তুমি! না, হতেও পারে। ক্লান্ত ছিলাম। এখনও দুর্বল লাগছে। কিছু খাবার পাঠিয়ে দাও না।'

বারান্দায় যেতেই ঘোষাল আর সুবল উদ্বিগ্নভাবে তাকাল আমার

দিকে।

বললাম, 'গতিক ভাল ঠেকছে না। কিছু মনে পড়ছে না তার।'

একটা ট্রে-তে কিছু খাবার নিয়ে চললাম। সুবল বলল, 'আমার হাতে দাও। একটু দেখেও আসি তাকে।'

রিমকির প্রতি সুবলের মন নরম হয়ে এসেছে লক্ষ্য করে হাসলাম। ট্রে-টা নিয়ে সে চলে গেল।

আমি বারান্দায় ফিরতেই শুনলাম এক তীব্র চিৎকার এবং ঝনঝন শব্দ। ঘোষাল আর আমি ছুটলাম রিমকির রুমের দিকে। দেখলাম সুবলের মুখ কাগজের মত সাদা। চোখ ঠিকরে বেরুচ্ছে কপাল থেকে। সে ছুটছে বাইরের দিকে।

খপ্ করে ধরে ফেললাম তার হাত। বললাম, 'কি হয়েছে তোমার?'

'যেয়ো না! ওখানে যেয়ো না! সে রুমের চারদিকে ভাসছে! ভেসে উঠে গেছে সিলিং পর্যন্ত!'

'মাথা খারাপ নাকি তোমার? ভেসে বেড়াচ্ছে মানে কি?'

ঘোষাল কিছু বললেন না। তাঁকে মনে হলো শঙ্কিত।

সাত

'শূন্যে ভাসছিলাম? ধ্যাৎ! ওটা সুবলের উদ্ভট কল্পনা,' বলল রিমকি দুষ্টু হাসি হেসে। বারান্দায় বসে আছি আমরা। সুবল হুইস্কি গিলছে ঢকঢক করে। রিমকি উঠে গিয়ে সুবলের গ্লাসটি কেড়ে নিল। 'যাও, বিছানায় গিয়ে ঘুমাও। নইলে আমি আবারও তোমার মাথার ওপর দিয়ে ভাসব।'

'না, না, তুমি আমার কাছে এসো না,' বলে সুবল পিছিয়ে গেল।

ঘোষাল বললেন, 'গরমে মাথা বিগড়ে গেছে ছেলেটার। যাকগে, রিমকি মা, এখন বলো ওই পাথরের ঘরটায় কি ঘটেছিল। মুংখ্রার কাছ থেকে কিছু বের করতে পেরেছ?'

'কিছুই না। আমার কিছুই মনে পড়ছে না।'

'ডাক্তার, আপনার সর্পবিষের অষুধ লাভের স্বপ্ন ব্যর্থ হলো। মুংখ্রাও নেই।'

'তাই বটে। তবু ভাবছি রিমকিকে সে কেন ওই ঘরে নিয়ে গেল? রিমকি যখন শুয়ে পড়ে তখন মুংখ্রা সেখানে ছিল না। অথচ আমরা গিয়ে দেখলাম মুংখ্রার লাশ। নাহ্, কিছু একটা রহস্য আছে এর মধ্যে। আমার মনে হয় সুবলের কথায় কোন সত্য থাকতেও পারে!'

আঁতকে উঠে প্রশ্ন করলাম, 'কি বলতে চান আপনি?'

এ সময় একদল পাহাড়ী ঘোড় সওয়ার (টিপরা না জমাতিয়া কে জানে) এসে থামল হোটেলের সামনে। রিমকি বলল, 'এরা কে?'

আতঙ্কিত হয়ে দেখলাম ওদের একজন সেই লম্বা-মোটা লোকটা। বললাম, 'ডাক্তার, ছুটে গিয়ে হোটেলওয়ালাকে বলুন থানায় খবর দিতে। এরা ডাকাত মনে হচ্ছে।'

ওরা ষোলো জন। তিন জন এসে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। লম্বা মোটা লোকটা উঠে এল বারান্দায়। বিশ্রামগঞ্জে দেখা সেই গুণ্ডাটা।

রিমকির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে পকেট থেকে দুমড়ানো একটা খবরের কাগজ বের করে বলল, 'ঠিক মিলে গেছে। ছবিটার সঙ্গে মিলে গেছে।'

সুবল বলল, 'কে এই লোকটা, কি চায় এখানে?'

'আমার নাম মাধো, মাধব দেববর্মা। তোমরা বাইরের লোক, তাই জানবে না আমার নাম।'

ঘোষাল চমকে উঠলেন নামটা শুনে।

'মাধো? পায়ে লাগাবার মালিশ টালিশ নাকি?' মন্তব্য করল রিমকি।

'আমি মাধো ডাকাত। আমাকে এ রাজ্যের সবাই জানে। তুমি রিমকি সামন্ত। ঠিক কিনা?'

রিমকি জবাব দিল না।

'তুমি সাগর সোম, রিপোর্টার?'

'তা ঠিক। এখন বলুন তো মশাই, আমাদের সঙ্গে আপনার কি কাজ?'

'গুরুত্বপূর্ণ কাজ' বলে সে আমাকে দেখাল দি সিটাডেল পত্রিকার পুরানো কপিটি, যাতে রিমকি সম্পর্কিত প্যাটেল সাহেবের সেই

বিজ্ঞাপনটি এবং পুরস্কারের ঘোষণাটা রয়েছে। বুঝলাম, কাগজটা কিভাবে যেন ডাকাতটার হাতে এসেছে। এবং ছবি দেখে সে রিমকিকে চিনে ফেলেছে।

রিমকি বিজ্ঞাপনটি দেখে আমাকে বলল, 'এক লাখ রুপী! তুমি এটা গোপন করেছিলে আমার কাছ থেকে?'

মাধো বলল, 'কেবল তাই নয়। আরও কথা আছে। পাহাড়ে প্রতাপ রিয়াং বলে একটি লোক আছে। আমার দোস্ত। তার কাছে শুনলাম এই সুন্দরীকে সে অপহরণ করবে। পরে সাগর বাবু একে উদ্ধার করবেন আগের বন্দোবস্ত মত। সাগর বাবু প্রতাপকে পুরস্কারের বিষয়ে কিছু জানাননি। মাত্র পাঁচ শো রুপী নগদ দিয়েছেন, আর দেড় হাজার পরে দেবেন বলেছেন। প্রতাপ এতে রেগে যায়। আমার কাছে গিয়ে পত্রিকাটা দেখায়। আমাকে এর একটা বিহিত করতে হয়। তাই এসেছি।'

'সাগর, তুমি এমন দু'মুখো শয়তান! এমন বেঈমান!'

'রিমকি, প্লীজ, খেপে যেয়ো না। পুরস্কারের কথাটা চেপে গিয়েছিলাম তোমাকে চমকে দেয়ার উদ্দেশ্যে। অপহরণ আর উদ্ধার নাটকে তোমার কোন ক্ষতি হত না। টাকাটা আমরা ভাগ করে নিতাম।'

'আর আমরা? আমাদের এতে কি লাভ হত?' বললেন ঘোষাল।

'দেখুন, পুরস্কারের লোভে আমি এখানে আসেনি। আমি খবরের কাগজের লোক। এক লাখ রুপী কিছুই না আমার কাছে। আমি এসেছি একটি দারুণ চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট বা গল্পের লোভে।'

মাধো বলল, 'থামুন মশাই। আমার কথা শেষ হয়নি। আমি এখন

একে নিয়ে যাব। সাগর বাবু পাঠাবেন অপহরণের খবর। তারপর আলাপ হবে পুরস্কার সম্পর্কে।'

'নিয়ে যাবেন?' প্রশ্ন করলাম হতভম্বের মত।

'অবশ্যই। কাগজটা বলছে তাকে অপহরণ করা হয়েছে। তাই আমি অপহরণটা করছি। আমি মুক্তিপণ দাবি করব দু'লাখ রুপী। ওটা পেতে দেরি হলে প্রথমে এর একটা কান কেটে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব। তিন দিন পরে আরেকটা কান। তারপরেও মুক্তিপণ না পেলে প্রতিদিন পাঠাব একটা করে আঙ্গুল।'

খপ করে রিমকির একটা বাহু ধরে টান দিল মাধো।

'হাত ছাড়, বেজন্মা পাহাড়ী কুত্তা!' গর্জে উঠল রিমকি।

অট্টহাসি হেসে মাধো একটা চড় মারল রিমকির গালে। রিমকি পেছন দিকে উল্টে ধপাস করে পড়ে গেল ফ্লোরে।

বাইরে দাঁড়ানো তিন দস্যু পিস্তল বাগিয়ে ধরল আমাদের দিকে। একজন হুকুম দিল, 'নড়বে না কেউ।' ওদেরকে অগ্রাহ্য করে রিমকির কাছে গিয়ে বললাম, 'আঘাত পেয়েছ কোথাও?' সঙ্গে সঙ্গে মাধো এক থাপ্পড় মারল আমার ঘাড়ে। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। সুবল টেবিলটা তুলে ছুঁড়ে মারল এক পিস্তল ধারীর দিকে। অন্য ডাকাতরা এসে ঘিরে ফেলল আমাদেরকে। মাধো আবার ধরল রিমকিকে। ক্রুদ্ধ বেড়ালের মত রিমকি তাকে আঁচড়াতে এবং খামচাতে লাগল। মাধো চুল ধরে শূন্যে তুলে ফেলল রিমকিকে। হো-হো করে হাসতে হাসতে ছেড়ে দিল হঠাৎ। আবার চুল ধরে টানতে টানতে একটা চেয়ারের কাছে নিয়ে গেল। বসে পড়ল চেয়ারটায়। আবার ছেড়ে দিল রিমকিকে। রিমকি টলতে টলতে বসে পড়ল ফ্লোরে।

'এখন আমরা যাব, বুঝলে খুদে ময়নাটি?'

'খবরদার হারামজাদা! গায়ে হাত দিবি না! কাবাব হয়ে যাবি!' বলল রিমকি গর্জে উঠে।

ঠিক তখনই ব্যাপারটা ঘটল।

হঠাৎ সাদা ধোঁয়ার এক কুণ্ডলী ঢেকে ফেলল দস্যু সর্দার মাধোকে। ধোঁয়া সরে যেতে দেখা গেল সে নেই। আমি তাকিয়ে ছিলাম। আমার চোখের সামনে সে মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার সঙ্গে।

রিমকি চেঁচিয়ে উঠে পিছিয়ে এসে আমার গায়ে পড়ল। তাকে আঁকড়ে ধরে দেখলাম ধোঁয়ার শেষটুকু মিশে যাচ্ছে হাওয়ায়।

অন্য দস্যুগুলো এই দৃশ্য দেখে মুহূর্তের মধ্যে লাফিয়ে উঠল তাদের ঘোড়ায়। পাগলের মত ছুটে পালাল রাস্তার দিকে।

'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করলাম রিমকিকে। সুবল মাটিতে কিল মারতে মারতে বলল, 'আমার আর সহ্য হচ্ছে না এসব। প্রথমে রিমকি ভাসল শূন্যে! এখন দস্যুটা মিলিয়ে গেল ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে! আমি পাগল হয়ে যাব গো, পাগল হয়ে যাব...'

ঘোষাল বললেন, 'আমি সবই দেখেছি। সাগর বাবু, এখন দেখলেন তো প্রেতবিদ্যা কাকে বলে?' এরপর রিমকিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি করেছ বলো দেখি?'

'আমি? আমি আবার কি করলাম?'

'নিশ্চয় এটা তোমার কাজ। সুবল যখন তোমাকে শূন্যে ভাসতে দেখেছে তখনি আমার সন্দেহ হয়েছিল। তুমি নিজের অজান্তে মুংখ্রার প্রেতশক্তি পেয়ে গেছ। মুংখ্রার প্রেতশক্তি ভর করেছে তোমার ওপর।'

ভয়ে পিছিয়ে গেল রিমকি। বলল, 'এসব পাগলের প্রলাপ। আমি

বিশ্বাস করি না।'

'তাহলে মাধো ডাকাত গেল কোথায়?' প্রশ্ন ঘোষালের ।

এ সময়ে আমার নজর পড়ল বারান্দার এক প্রান্তে। কাছে গিয়ে দেখলাম সদ্য তৈরি তন্দুরি কাবাব। 'এটা কোত্থেকে এল?'

রিমকি কাবাবটা এক নজর দেখেই একটা কাতর ধ্বনি করে গড়িয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে।

'রিমকি কি বলেছিল শোনেননি? মাধো কাবাব হয়ে গেছে। ওটাই মাধোর শেষ চিহ্ন,' বললেন ঘোষাল।

'আমরা দু'জনই কি পাগল হয়ে যাচ্ছি?'

'সে বলেছিল মাধোকে "কাবাব হয়ে যাবি"। মাধো কাবাব হয়ে গেছে। এবার বুঝলেন ওর শক্তি?'

ক্রুদ্ধভাবে বললাম, 'রাখুন তো ওসব বকবকানি! চলুন ওকে ঘরে নিয়ে যাই।'

বিছানায় শুইয়ে দেয়ার কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলে রিমকি আমাকে বলল ঘুম জড়ানো স্বরে, 'ভয়ঙ্কর একটা স্বপ্ন দেখলাম। ভয়ঙ্কর স্বপ্ন…।' আবার ঘুমিয়ে পড়ল সে।

বাইরে এসে সুবলকে জিজ্ঞেস করলাম কাবাবটি কোথায়। সে বলল হোটেলওয়ালার কুকুর ওটা খেয়ে ফেলেছে।

'কুকুরে খেয়েছে?'

সুবল বলল, 'কেন খাবে না। ভাল কাবাব।'

'জানো, ওই কাবাবটা আসলে মাধো ডাকাত?'

'ওটা কাবাব নয়, মাধো ডাকাত?'

'হ্যাঁ সুবল, রিমকি মাধোকে কাবাব বানিয়ে ফেলেছে,' বললেন

ঘোষাল।

'তোমরা আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। ও মা, মাগো, তোমার ছেলে পাগল হয়ে যাচ্ছে,' বলে মাথা ঝাঁকাতে লাগল সুবল।

হোটেলওয়ালার বিরাট কুকুরটা শুয়েছিল বাইরে গাছতলায়। মুখ চাটছিল লম্বা জিহ্বা দিয়ে।

'মাধোকে খেয়েছে কুকুরটা। মাধোর ভাগ্য যেন আমার কোন দুশমনেরও না হয়,' বললেন ডাক্তার।

হঠাৎ আমার মনে হলো রিমকির যদি এ শক্তি থাকে তাহলে আমরাও তো তার হাতে জিম্মি। সে-তো আমাদেরকেও পান্তাভাত, পুলিপিঠা বানিয়ে ফেলতে পারে!

ডাক্তার একথা শুনে মাথা ঘুরে ঢলে পড়লেন আমার ঘাড়ে।

আট

পরদিন ঘুম ভাঙল দেরিতে। বিছানায় বসে ভাবতে লাগলাম। আমার সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেছে। আমি আধুনিক খবরের কাগজের লোক। অলৌকিক ঘটনা আমার হিসাবের মধ্যে ছিল না। সুন্দরী মেয়ে অপহৃত হবার কেচ্ছা বাতিল। তবে সুন্দরী মেয়ের অলৌকিক ক্ষমতার গল্প প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হবার যোগ্য। কিন্তু প্যাটেল সাহেবের প্রতিক্রিয়া কি হবে? তাঁর সামনে ওটা দেখানোর আগেই তো আমাকে ছাঁটাই করে দেবেন। তবে রিমকিকে অবশ্য বলতে পারি যে প্যাটেল সাহেবকে এমন ভাবে ভড়কে দাও যাতে তিনি আমাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করেন। রিমকিকেই বা কিভাবে সামলাব? আগেই ছিল জেদী। এখন প্রেতশক্তি পেয়ে আরও জেদী হয়ে উঠবে না?

দস্যু সর্দার মাধোর কথা ভাবতেই ঠাণ্ডা ঘাম বের হলো কপালে। তার কাহিনী কখনও লেখা যাবে না। কোন প্রমাণ নেই, কেউ বিশ্বাস করবে না। প্যাটেল আমাকে সোজা পাগলা গারদে পাঠাবেন।

এক লাখ রূপী পুরস্কারের কি হবে? প্যাটেল আর রিমকি দু'জনকে খুশি রেখে অপহরণের ব্যাপারটি কিভাবে ম্যানেজ করা যায়? অবশ্য পুরস্কারটা পেলেও রিমকি যা মেয়ে একখানা, সবটাই হাতিয়ে নেবে।

ঝগড়া করতে গেলেই আমাকে হ্যামবার্গার বা মুরগী কাবাব বানিয়ে ফেলবে। আমার তাহলে কি করা উচিত? তল্পি গুটিয়ে চুপচাপ কেটে পড়ব?

দরজায় ঠুকঠুক করে রিমকি এল আমার রুমে। দরজা বন্ধ করে বলল, 'আমার ভয় করছে। কিছু একটা হয়েছে আমার।'

'কি হয়েছে তোমার?'

'জানি না। মনে হচ্ছে...আচ্ছা, কাল যা ঘটল ওটা কি স্বপ্ন?' বলল রিমকি উদ্বিগ্নকণ্ঠে।

'না, স্বপ্ন নয়। আমরা দুঃখিত তোমাকে এর মধ্যে জড়িয়েছি বলে।'

'দেখ, কি ঘটেছে তার কিছু আমার মনে পড়ছে,' বলল সে। 'মনে পড়ছে রাংখল গুণীনটাকে। ওই পাথরের ঘরটাতে বসে ছিলাম তার সঙ্গে। কথা হয়নি কারও সঙ্গে কারও। চুপচাপ বসে পরস্পরের ভাবনা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। ভয়ানক ব্যাপার। এক পর্যায়ে টের পেলাম সে আমার মনের কথা সব বুঝে ফেলছে। কিছুই গোপন রাখতে পারছি না। মনে মনে কথা হলো। সে আমাকে অনেক কথা বলল। কি বলল স্মরণ নেই। একটা জিনিস পান করতে দিল আমাকে। খুব তেতো। ওটা গিলে ফেলার পরে যেন দেখলাম ঘরটার কোণ থেকে কালো একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হয়ে এল। আগুন-টাগুন কিছু নেই, শুধু কালো ধোঁয়া। ধোঁয়াটা হয়ে গেল কালো ছায়া। যেন একটি নারীর ছায়ামূর্তি। মূর্তিটা ভাসতে লাগল আমাদের চারপাশে।'

আমি কিছু বললাম না। শুনতে লাগলাম চুপ করে।

'ওই কালো ছায়াটিকে গতকাল ওই ঘটনাটা ঘটবার আগ মুহূর্তে দেখেছি মাধো ডাকাতের পেছনে। আরও কথা আছে। তুমি হয়তো

বুঝবে না। কাল রাতে বিছানায় শোবার পরে দেখলাম একটা ছায়ামূর্তি বিছানা থেকে উঠে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। মনে হলো ওটা আমার ভেতর থেকেই বের হয়েছে। দেখতে ঠিক আমারই মত। ওটা বেরিয়ে যাবার পরে আমার অন্য রকম লাগল।'

'তুমি স্বপ্ন দেখেছ।'

'না, সাগর, স্বপ্ন নয়। আমার এখন অন্য রকম লাগছে।'

'কি রকম লাগছে?'

'অনেক হালকা এবং সুখী মনে হচ্ছে। আমি যেন মানসিক স্নানে পরিষ্কার পবিত্র হয়ে গেছি। কি হচ্ছে আমার বলো তো?'

'কিচ্ছু হচ্ছে না। তুমি ভাল আছ। ওই পুরস্কারটা পেয়ে নি। তারপরে আরও মজা লাগবে,' বললাম তাকে হাতটা ধরে।

'আমার পুরস্কারের দরকার নেই। কাল তোমাকে গাল দিয়েছিলাম। আজ মনে হচ্ছে পুরস্কারের লোভে অপহৃত হবার নাটক করা সৎকাজ হবে না।'

রিমকি বলছে সততার কথা! এবার বুঝলাম, কিছু একটা তার হয়ে গেছে।

সুবল এল। তার পেছনে হোটেলওয়ালার কুকুরটি। 'ওর নাম দিয়েছি হিটলার। ও এখন আমাকে খুব পছন্দ করে।'

'এ কুকুরটাই তো মাধোকে খেয়েছে,' বললাম তাকে।

'মাধোকে নয়, কাবাব খেয়েছে। তোমার আর ডাক্তারের মাথার চিকিৎসা দরকার,' বলল সুবল।

কুকুরটি হাই তুলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। চার পা বুকের ওপর গুটানো। দৃশ্যটা সহ্য হলো না। বললাম, 'সুবল, এসেছ খুশি

হয়েছি। এখন দয়া করে তোমার কুকুরটাকে নিয়ে বাইরে একটু বেড়াতে যাও।'

'ঘোষাল আসছে। কথা বলবে। আমি ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিয়ে এসেছি।'

'বেশ করেছ। তাহলে তোমার হিটলারকে কিছু একটা দিয়ে ঢেকে দাও। ওটার দিকে তাকিয়ে ব্রেকফাস্ট গেলা যাবে না।'

'কুকুরটার শরীর ভাল না,' বলল সুবল।

'ভাল হবে কি করে? ওর পেটে যে মাধো ডাকাত।'

কুকুরটি গড়িয়ে কাত হলো। আমার চোখে চোখ রেখে কথা বলে উঠল মানুষের ভাষায়, 'ঠিকই বলেছ দোস্ত। মাধো ডাকাত পাথরের মত পড়ে আছে আমার পেটে।'

আঁতকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম বিছানায়। রিমকির গলা থেকে বেরুল চাপা আর্তনাদ।

'কুকুরটা কথা বলল?' জিজ্ঞেস করলাম সুবলকে।

'নিশ্চয়ই। রাতভর কথা বলেছে আমার সঙ্গে,' বলল সে।

'তার মানে? কুকুরে কথা বলে শুনেছ কখনও?'

'না। তবে এই রাজ্যে সবই ঘটতে পারে। মেয়ে শূন্যে ভাসে, মানুষ অদৃশ্য হয়। কুকুর কথা বলবে না কেন?'

রিমকি চলে যেতে চাইল রুম থেকে। 'যাবে না, যেখানে আছ সেখানে থাকো,' বলল কুকুরটা।

'কেউ ভেল্কিবাজি দেখাচ্ছে না তো আমাদেরকে?' বললাম রিমকিকে।

'দেখো বাপু, আমি তোমাদের জঘন্য ভাষায় কথা বলছি বলে অত

উতলা হবার দরকার নেই। যাকগে, আমারও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে। সকালের নাস্তাও বাকি। আমি যাই,' বলে কুকুরটা বেরিয়ে গেল।

'এ এক বিভীষিকার মত,' বললাম সুবলকে।

সুবল বলল, 'কুকুরটা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। বলেছে কাল রাতে।'

রিমকি বলল, 'তুমি তাহলে ওটাকে নিয়ে চলে যাও। আমরা কাঁদব না তোমার জন্য।'

এসময় ঘোষাল এসে বলল, 'তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।'

'কুকুরের ব্যাপারটা শুনেছেন?' জানতে চাইলাম।

'কোন্ কুকুর?'

'মাধোকে যে খেয়েছে।'

'কি হয়েছে ওটার?'

'কথা বলছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে চাচ্ছে।'

'তাই নাকি! আমি মোটেই আশ্চর্য হচ্ছি না। অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্তে এসেছি যে এখানে যা কিছুই ঘটুক আশ্চর্য হওয়া চলবে না। রিমকির ওপর যখন মুংখ্রার প্রেতবিদ্যার প্রভাব পড়েছে তখন অনেক অদ্ভুত ঘটনাই সম্ভব।'

'রিমকিই তাহলে সবকিছুর মূলে,' বললাম মৃদু হেসে।

'অবশ্যই। প্রেতবিদ্যার শক্তির কথা যখন বলেছিলাম তখন কেউ বিশ্বাস করেননি। এখন দেখলেন নিজের চোখে। আমি এ বিষয়েই আলাপ করতে চাই রিমকির সঙ্গে।'

'বলুন।'

'দেখ মেয়ে, আমি নিশ্চিত যে তুমি অসীম শক্তি পেয়েছ। ওই শক্তি যাতে তোমাকে না চালাতে পারে, ওটা যাতে তোমার বশে থাকে, সেই চেষ্টাই করতে হবে। আমি এই ব্যাপারটা কিছু কিছু জানি। কিছু কিছু চর্চাও করেছি। জানি যে মনের দিক থেকে সঠিক অবস্থা না থাকলে তুমি কিছুই করতে পারো না। যেমন এখন। এখন তুমি আরামে বসে আছ। তোমার কোন উদ্বেগ নেই। এখন তুমি সেই শক্তিকে জাগাতে পারবে না। কিন্তু গতরাতে পেরেছ। দস্যুদের হামলায় ভয় পেয়েছিলে। তখনই ছিল শক্তি প্রদর্শনের উপযুক্ত সময়। এ শক্তির অপচয় কোরো না।'

রিমকি বলল, 'আমি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাই। শান্তি চাই, নির্জনতা চাই।'

'হতাশ করলে। যে শক্তি তোমার আছে তা দিয়ে তুমি দুনিয়ার মালিক হতে পারো। তোমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই?'

'আমি ওসব চাই না।'

'রিমকি ঠিকই বলছে। আচ্ছা বলুন তো, ওর এ শক্তিটা কতদিন থাকবে?' জিজ্ঞেস করলাম ঘোষালকে।

'রাংখল গুণীনরা তাদের ক্রিয়াকর্ম শুরু করে চাঁদের শুক্লপক্ষের প্রথম রাতে। বোধ হয় চাঁদের কিছু প্রভাব আছে এর ওপর। সেক্ষেত্রে রিমকির শক্তিটা অমাবশ্যা পর্যন্ত থাকবে। তারপর চলে যাবে। মুংখা মারা যাওয়ায় এ শক্তি রিমকি আর ফিরে পাবে না।'

'আমাকে তাহলে খুব সাবধানে চলতে হবে আগামী কয়েক সপ্তাহ। আমি চাই না এ সময়ে আমার দ্বারা আর কিছু ঘটুক,' বলল রিমকি।

'আমার সর্পদংশনের ওষুধের কি হবে?' বললেন ঘোষাল হতাশ হয়ে।

'দুঃখিত, ডাক্তার।'

'সাগরবাবু, আপনি ওকে একটু বোঝাতে পারেন না?'

'কি বোঝাব? সে পুরস্কারের টাকাটাও আর চায় না,' জবাব দিলাম।

'তাহলে আমাদের স্বার্থটা সে বিবেচনা করবে না?' ফুঁসে উঠল সুবল।

'ওই পুরস্কার নেয়া অন্যায় হবে,' বলল রিমকি।

'কি বললে? ইয়ার্কি করছ নাকি?' বলল সুবল।

'তোমাব যা খুশি বলতে পারো। আমি এসবের মধ্যে নেই,' সাফ জবাব রিমকির।

আমি ভাবলাম আমার কি হবে। প্যাটেল সাহেবকে কি জবাব দেব ওকে দিল্লী নিয়ে যেতে না পারলে?

এসময় হোটেলের বয় এসে আমাকে একটা টেলিগ্রাম দিল। শেঠির টেলিগ্রাম: প্যাটেল জানাচ্ছেন রিমকি সামন্তকে পাওয়া গেছে...তুমি ওখানে কি করছ...নাগরিক অনুষ্ঠানে মেয়ের বাবা পুরস্কার গ্রহণ করবে...প্যাটেল আগুন...শেঠ।'

'সর্বনাশ হয়ে গেছে,' বলে তারবার্তাটা রিমকিকে দিলাম।

'এটা কি? এর মানে কি? একি তোমার আরেক চালবাজি?' চেঁচিয়ে উঠল রিমকি তারবার্তাটা পড়ে।

'আমার মনে হয় তোমার বাবা আরেকটি মেয়েকে তুমি সাজিয়ে প্যাটেলকে ধোঁকা দিয়ে পুবস্কারটা হাতিয়ে নেয়ার ফন্দি করেছে!' বললাম তাকে।

'এত বড় ধোঁকাবাজি!' বলে রাগে কাঁপতে লাগল রিমকি। সঙ্গে

সঙ্গে সে উঠে গেল শূন্যে, তিন ফুট ওপরে। হতভম্ব হয়ে গেলাম আমরা তিনজন। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো সে নিজে। বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কা সামলে রিমকি আমার কাঁধ ধরে নিজেকে নামিয়ে আনল। ভয় পেয়েছে, তবু বলল, 'বেশ মজা তো! আমি উড়ে বেড়াতেও পারি মনে হচ্ছে।'

চোখ বন্ধ করে সুবল বলল, 'এ দৃশ্য আর দেখতে পারব না! আমি পাগল হয়ে যাব!'

রিমকি আবার উঠে গেল শূন্যে। পা মেলে শোয়া অবস্থায়। ঘোষাল তাকে একটা ঠেলা দিল। সে ভেসে বেড়াতে লাগল সারা ঘরে আমাদের মাথার ওপর দিয়ে।

কিছুক্ষণ পরে যে শক্তিটা তাকে শূন্যে ধরে রেখেছিল সেটা যেন তাকে ছেড়ে দিল। সে নেমে এল বিছানায় আগের জায়গায়।

আমি বললাম, 'রিমকি, তুমি শূন্যে উড়তে পারো ভাল কথা। কিন্তু তোমার বাপের এ বাঁদরামি কিভাবে ঠেকাব বলো দেখি?'

'ওটা নিয়ে আলোচনার কিছু নেই। আমি দেখা করব বাবার সঙ্গে।'

'দেখো, আমাদেরকে দিল্লী রওয়ানা হতে হবে,' বললাম তাকে।

'সুবল আর আমিও যাচ্ছি,' বললেন ঘোষাল।

'ঠিক এ সময় রুমের দরজা ঠেলে প্রবেশ করল হিটলার। 'দিল্লী যাবে? আমিও যাব,' বলল সে।

'দেখো, আমরা কুকুর পছন্দ করি না। দিল্লী যেতে হলে তোমাকে নিজের ব্যবস্থা নিজে করতে হবে,' বলে দিলাম কড়া সুরে।

ঘোষাল বললেন, 'আরে কুকুরটা তো অমূল্য ধন! এটাকে নিয়ে যেতেই হবে!'

কুকুরটি সন্দেহের দৃষ্টিতে বুড়োকে দেখে নিয়ে বলল, 'আমাকে

ব্যবহার করে পয়সা কামানোর মতলব? ওসব চলবে না। এখানকার কুত্তাগুলোর ওপর বিরক্তি ধরে গেছে। সেজন্যই যেতে চাচ্ছি।'

'কেমন ভদ্রলোকের মত কথা বলছে শুনছ?' বলল সুবল গর্বিতভাবে।

'নাহ্, আমার মাথাটা খারাপ হয়ে যাবে,' বলে রিমকি বেরিয়ে গেল।

গম্ভীরভাবে হিটলার বলল, 'দারুণ মেয়ে। যে পাবে ওকে, সেই ব্যাটা ভাগ্যবান।'

নয়

দিল্লীতে পৌঁছলাম সন্ধ্যায়। খুব কম খরচের একটা ভদ্র হোটেল জানা ছিল। নাম 'স্টার অব ম্যাড্রাস'। সেখানে গেলাম। হিটলারকে হোটেলে ঢুকতে দিতে অস্বীকার করল তরুণী রিসেপশনিস্ট। হিটলার তখন এমন কটমটে দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল তরুণীটির দিকে যে ভয় হলো ব্যাটা আবার কিছু বলে ফেলে কিনা। ভাগ্য ভাল, মুখ খোলেনি কুকুরটা। ম্যানেজার আমার পূর্ব পরিচিত। জানেন আমি দি-সিটাডেলের লোক। তাই শেষ পর্যন্ত হিটলারেরও থাকার ব্যবস্থা হলো।

সবাই চলে গেল যার যার রুমে। ঘণ্টাখানেক পরে একত্র হব ডাইনিং হলে। ঠিক করলাম হোটেলের বিলটা শেঠই দিবে। আমার টেলিফোন পেয়ে শেঠকে খুব খুশি মনে হলো না। আমি বললাম প্যাটেলের ভাবনা বাদ দিয়ে আমাদের হোটেলে চলে আসতে। অনেক চমক অপেক্ষা করছে তার জন্য।

আধঘণ্টা পরেই এল শেঠ। বলল, আমার দোষে প্যাটেলের লাখরুপী গেছে। পুরস্কারের টাকাটা না দিয়ে উপায় ছিল না।

বললাম, কি ঘটেছে খুলে বলতে।

'শোনো সাগর, ওই ঘড়েল দেবদাস সামন্ত প্যাটেল সাহেবের

অফিসে ঢুকে পড়ে তার মেয়েকে নিয়ে। বলে, কৈলাশ মাথুর নামের এক লোক উদ্ধার করে এনেছে তার মেয়েকে। কৈলাস মাথুর ছিল ওদের সঙ্গে। সে বলে, দি সিটাডেলের বিজ্ঞাপনটা দেখামাত্রই তার মনে পড়ে যায় যে ওই সামন্ত মেয়েটাকে সে দেখেছে এক এলাহাবাদী যুবকের সাথে। তখনি সে পিছু নেয় ওদের। যুবকটির সঙ্গ থেকে রিমকিকে ছাড়াতে এবং দিল্লী নিয়ে আসতে তেমন বেগ পেতে হয়নি তাকে। কারণ, এলাহাবাদে তারও কিছু লোকজন আছে। দিল্লীতে এনে মেয়েকে সে সঁপে দেয় দেবদাস সামন্তের হাতে। তারপর তিনজনে মিলে এসেছে প্যাটেল সাহেবের কাছে পুরস্কারটার জন্য।'

'কৈলাস মাথুর কে?'

শেঠ বলল, 'আমার বিশ্বাস কোন ধড়িবাজ টাউট-বাটপার হবে।'

'শেঠ, রিমকি সামন্ত এ মুহূর্তে এই হোটেলেই আছে। সে দিল্লীতে আসেইনি। প্যাটেলকে যেদিন মেয়েটিকে পাবার কথা জানিয়েছি সেদিন থেকে আমার সঙ্গেই আছে। তুমি আমাকে রিমকির যে ফটো দিয়েছিলে তার সাথে আমার খুঁজে পাওয়া মেয়ের হুবহু মিল।'

শেঠ একটা ফটো দেখাল আমাকে। প্যাটেল সাহেবের অফিসে তোলা। ভাল করে তাকিয়ে দেখলাম এ ছবির মেয়েটা অবিকল রিমকির মত। চোখ, মুখ, নাক, কান, শরীর, দাঁড়াবার ভঙ্গি সব এক। শুধু চাহনিটা যেন অন্য রকম।

'কোন একটা গোলমাল আছে এখানে। সেটা কি, বলতে পারব না। আচ্ছা, এ ছবিটা কবে তোলা হয়েছে, শেঠ?'

'তিনদিন আগে।'

'তিনদিন আগে রিমকি সামন্ত আমাদের সঙ্গেই ছিল বিশালগড়ে।'

'তুমি কি মাতাল হয়েছ?' প্রশ্ন করল শেঠ। 'কে বিশ্বাস করবে তোমার কথা?'

'থামো, ওদিকে দেখো,' বললাম তাকে।

রিমকি এসে দাঁড়িয়েছে হলঘরে। সেই জরীর কাজ করা লাল পাড়ের সাদা সিল্কের শাড়ি পরে।

সবার চোখ তার দিকে। কেউ চোখ ফেরাতে পারছে না। আমি তাকে ইশারায় ডেকে এনে পরিচয় করিয়ে দিলাম শেঠের সাথে। শেঠ বিস্মিত হলো। বিড়বিড় করে বলল, 'যমজ...যমজ...' হাত বাড়িয়ে অফিসে তোলা ছবিটি দিল রিমকিকে।

ছবিটা খুঁটিয়ে দেখে রিমকি বলল, 'সাগর, এরকম পোশাকে আমাকে কখনও দেখেছ? এরকম ছিনালী দৃষ্টি দেখেছ আমার চোখে? এরকম সেক্সিভাব দেখেছ?'

আমি তখনি বুঝে ফেললাম এ ফটোর মেয়েটির সাথে রিমকির পার্থক্য। 'এই নষ্ট মেয়েটাই আমার নকল সেজেছে। আমার বাবার মুখটা দেখো। হাড্ডি পেলে কুত্তার মুখে যেভাব ফুটে ওঠে তাই ফুটে উঠেছে,' বলল রিমকি।

'শেঠ, এখন বুঝলে তো কিভাবে প্যাটেলকে ঠকানো হয়েছে?'

'কিন্তু প্যাটেলকে কেমন করে বোঝাব?'

সুবল আর ঘোষাল এসে জুটল আমাদের সঙ্গে। আমি ফটোটা দিলাম ঘোষালকে। মাঝখানে দাঁড়ানো মিস্টার আর. কে প্যাটেলকে দেখিয়ে দিলাম। ঘোষাল কোন মন্তব্য করলেন না।

কিন্তু সুবল বলল, 'দিল্লীতে তোলা ছবিতে রিমকি থাকে কেমন করে? সে-তো ছিল আমাদের সঙ্গে।'

রিমকি বলল, 'আরে বোকারাম, ওটা আমি নই। কপালে চোখ নেই তোমার?'

'ঠিক, ওটা তুমি নও । তবে তোমার দৈহিক ভূগোলটা সে নিশ্চয়ই ধার নিয়েছে,' বলল সুবল।

শেঠ আমাকে বলল যে আমার ব্যর্থতায় ক্রুদ্ধ হয়ে প্যাটেল আমাকে বরখাস্ত করেছেন। হতভম্ব হয়ে গেলাম। বললাম, 'ঠিক আছে। তবে পকেট খালি হয়ে গেলে ধার-টার দেবে তো?'

'নিশ্চয়ই দেব। তবে এ মেয়েটার ব্যাপারে কিছু করতে পারব না, কারণ আমি বিভ্রান্ত।'

শেঠ বিদায় নেয়ার পর ঘোষাল বললেন, 'দেবদাস সামন্তকে এবং রিমকি সেজে যে মেয়েটি অভিনয় করছে তাকে খুঁজে বের করতে হবে। নষ্ট করার সময় আমাদের নেই।'

ঘোষালের চোখেমুখে গভীর উদ্বেগের ভাব লক্ষ করে প্রশ্ন করলাম, 'আপনি কি ভাবছেন?'

'অনেক কিছু। প্রেতবিদ্যার সাথে অশুভ শক্তির যোগ আছে। মনে হচ্ছে কোন অশুভ শক্তি ছাড়া পেয়েছে।'

দশ

তিন দিন ধরে চেষ্টা করছি রিমকির বাবাকে খুঁজে বের করতে। রিমকির মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে। আগের রিমকি নেই। সে এখন অতি ভদ্র, বিনয়ী, লাজুক এবং সততায় বিশ্বাসী। প্রেসক্লাব ঘুরে একটু রাত করে হোটেলে ফিরেছি। সিঁড়িটা অন্ধকার। দাঁড়িয়ে ভাবছি অন্ধকারে সিঁড়িতে পা রাখব কিনা। হঠাৎ কে যেন সামনের দরজা খুলে ঢুকল। বললাম, 'কে?' জবাব না দিয়ে ছায়ার মত একজন দৌড় মারল সিঁড়ি ভেঙে ওপর দিকে। একটি নারীমূর্তি।

আমিও ছুটলাম পিছন পিছন। সোজা গিয়ে 'নক' করলাম রিমকির দরজায়। সাড়া না পেয়ে দরজা ঠেলে ভিতরে গেলাম। রুম অন্ধকার। সুইচ টিপে বাতি জ্বালালাম।

রিমকি উঠে বসেছে বিছানায়। 'মতলব কি তোমার? মদ টেনে এসেছ? বেরিয়ে যাও।'

'তুমি তো এখনি আমার পাশ দিয়ে ওপরে উঠে এলে। দু'সেকেণ্ডের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়লে কিভাবে?'

'তুমি মাতাল!'

দেখলাম তার পোশাক স্তূপ হয়ে পড়ে বিছানার কাছে। ধরে

দেখলাম এখনও গরম।

'বেরিয়ে যাও বলছি। নইলে তোমাকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলব।'

চমকে উঠলাম। এ যে আগের রিমকি! বিশালগড়ের রিমকি!

'ওই দেখো, তোমার কাপড় ফ্লোরে পড়ে আছে। সন্ধ্যায় এগুলো তোমার গায়ে ছিল না।'

'তাই তো! এগুলো তো সুটকেসে ছিল!'

'ঠিক আছে। জানতে চাইব না কোথায় গিয়েছিলে আজ রাতে।'

'কোথাও যাইনি। শুয়ে ছিলাম।'

'ঠিক আছে ঘুমাও,' বলে বেরিয়ে গেলাম।

ঘুম এল না চোখে। আমি হলপ করে বলতে পারি আমার সামনে দিয়ে দৌড়ে যে উঠে এল দোতলায় সে রিমকি। কিন্তু সে কি করে সেকেণ্ডের মধ্যে বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল? সে কি মিথ্যা ঘুমের ভান করেছে?

পরদিন সকালে ঘোষাল এসে বললেন যে কয়েকটা জিনিস বুঝতে পারছেন না। রিমকির কোন যমজ বোন নেই। অথচ ফটোতে যে মেয়েটিকে দেখলেন সে অবিকল রিমকি। এটা কিভাবে সম্ভব হয়?

আমি বললাম যে দেবদাস সামন্ত হয়তো কোন অভিনেত্রীকে ধরেছে। মেক-আপ নিয়ে সে রিমকি সেজেছে।

ঘোষাল বললেন যে এর একটা ব্যাখ্যা তাঁর মনে জাগছে। তবে সেটা এখনি বলবেন না। গত দু'তিন দিনে রিমকির মধ্যে তিনি একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। রিমকি বদলে গেছে। আমি তখন গত রাতের ঘটনা বললাম। উদ্বিগ্ন মুখে শুনে ঘোষাল বললেন, তাহলে তাঁর অনুমানই ঠিক।

'আপনি কি 'ড. জেকিল অ্যাণ্ড মি. হাইড' বইটা পড়েছেন?

বললাম পড়েছি। কিন্তু তাতে কি হলো?

'অনেক কিছু। গল্পটা হচ্ছে মানুষের মধ্যে যে ভাল আর মন্দ থাকে তাকে পৃথক করা নিয়ে। রাংখল গুণীনরা সেটা করতে পারে। আমার মনে হয় রিমকির ব্যাপারে ওটাই ঘটেছে।'

'বাজে বকবেন না,' বললাম তাঁকে।

'ভয় পাবেন না, শুনুন। আমার ধারণা, মুংখ্রা রিমকির মধ্যেকার ভাল আর মন্দকে পৃথক করে দু'টিকে আলাদা দৈহিক অবয়ব দিয়েছে। নতুন সৃষ্ট মন্দ রূপটি ভাল রূপটিকে অনুসরণ করে। এমনি করে দুটি রিমকি সৃষ্টি হয়েছে। একটিতে রয়েছে তার সকল ভাল গুণগুলো, অন্যটিতে রয়েছে সব খারাপ দোষগুলো।'

'আপনি তাহলে মনে করেন রিমকি ইচ্ছা করলে দু'জন হয়ে যেতে পারে?'

'না, ইচ্ছা করলে নয়। যখন সে বেখেয়াল থাকে, অসতর্ক থাকে তখন।'

'কাল রাতে বোধহয় তাই ঘটেছে। মন্দটা এসে মিশে গেছে ভালটার মধ্যে।'

'হ্যাঁ, তাই হয়েছে।'

'তাহলে তো বিপদ। ভালটা বাধা দেয়নি কেন?'

'দেখুন, ভাল মন্দ প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। আমরা যদি সতর্ক না থাকি, মন্দকে নিয়ন্ত্রিত না রাখি, তাহলে অনেক অনর্থ ঘটে যায়। মন্দটার কৃতকর্মের দোষে রিমকি কষ্ট পেলে আমি সইতে পারব না।'

'বুঝলাম না।'

'দেখুন, ফটোতে যে রিমকিকে দেখেছেন সে যদি কোন অপরাধ করে বসে তাহলে দোষটা এসে চাপতে পারে আমাদের ভাল রিমকির ওপর।'

'কেন?'

'ওরা হুবহু এক চেহারার। আঙুলের ছাপও মিলে যাবে।'

আমার মাথায় চক্কর দিয়ে উঠল ঘোষালের কথা শুনে। ফোন করলাম দি সিটাডেলের দিল্লী ক্রাইম রিপোর্টার হরকিষেন সিংকে। বললাম একটা বিপদে পড়ে গেছি। কৈলাশ মাথুর নামে কোন লোক জানা থাকলে যেন তার বিবরণ আমাকে জানায়। হরকিষেন বলল সে চেষ্টা করবে।

সুবল এসে বলল, 'কি কাণ্ড হয়েছে জানো? হিটলার গিয়ে জুটেছে মেয়েটার সঙ্গে। দু'জনে কি সব বড় বড় কথা নিয়ে আলোচনা করছে। এমন ভাষায়, যা আমার মাথায় ঢোকেনি।'

'খুব বুদ্ধিমান কুকুর,' মন্তব্য করলেন ডাক্তার।

একটু পরে হিটলার এসে বলল, 'নমস্তে, নমস্তে। আমার ব্রেকফাস্ট তো দেয়নি এখনও। কিছু মুরগী কাবাব-টাবা না হলে আর চলছে না।'

'হবে, হবে,' বলে সুবল নিয়ে গেল কুকুরটাকে।

'কুকুরটার ভাবসাব দেখছেন?' বলে চলে গেলাম রিমকির দরজায়। টোকা দিতেই বলল, 'এসো।'

রুমে পা দিয়েই দেখি কেউ নেই, রুম ফাঁকা। 'তুমি কোথায় রিমকি?'

'এই যে এখানে,' বলে আমার মাথায় হালকা চাপড় দিল সে। সিলিং-এর কাছে শূন্যে লম্বা হয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে।

'ওসব করছ কেন? নেমে এসো।'

ধীরে নেমে এল সে আমার মুখের সমান্তরালে। আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে ফ্লোরে পা রেখে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি কাল মাতাল হয়ে এসেছিলে? আমি এখনও একটু রেগে আছি তোমার ওপর। জানো, আমি খুব ভয় পেয়ে গেছি। স্বপ্ন দেখেছি রাতে কে একজন এসে ঢুকে পড়েছে আমার শরীরে। তুমি আমাকে যখন জাগালে তখন ফ্লোরে কিছু জামা কাপড় দেখোনি?'

'দেখেছি। চেয়ারেও দেখেছি।'

'চেয়ারেরগুলো আমার। ফ্লোরেরগুলো আমার নয়। ওগুলো এখন নেই। কি ঘটছে এখানে?'

'জানি না।' এখন নিশ্চিত হলাম যে ঘোষালের কথাই ঠিক। ওরা দু'জন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। 'শোনো রিমকি, চিন্তা কোরো না। আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে লাঞ্চ করব একসঙ্গে "ডায়মণ্ড" রেস্তোরাঁয়। তুমি চলে যেয়ো ওখানে।'

'ঠিক আছে, যাও।'

এগারো

দি সিটাডেলের ক্রাইম রিপোর্টার হরকিষেন সিং-কে পেলাম অফিসের পিছনের রেস্তোরাঁয়। জানতে চাইলাম দেবদাস সামন্তর খবর। সিং বলল সে জানে না। পুরস্কার নিয়ে বাপ-মেয়ে উধাও হয়ে গেছে। কৈলাস মাথুর সম্পর্কেও বেশি কিছু জানে না। বলল, পুরস্কার গ্রহণের জন্য যখন প্যাটেল সাহেবের অফিসে আসে তখন দেখা হয়েছিল। যাবার সময় বলেছিল হংস ভরদ্বাজের কাছে যাবে। তাই তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে।

'কোন্ হংস ভরদ্বাজ? বস্তি এলাকার মস্তানটা?' সিং বলল, 'এখন সে বড়লোক। বিজেপি দলে যোগ দিয়েছে। ছয় মাস আগে ট্যাক্সিচালক ইউনিয়ন দখল করেছে। ট্যাক্সি মালিকরা কাঁপে তার ভয়ে। অনেক টাকা আদায় করেছে ওদের কাছ থেকে। নিজে একটা পরিবহন কোম্পানী খুলেছে।'

বুঝলাম কৈলাশ মাথুর ও ভরদ্বাজ একই লাইনের লোক হবে এবং ভরদ্বাজের কাছে তার হদিশ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভরদ্বাজের কাছে কেন গেছে মাথুর? সামন্তরা বাপ-মেয়ে মিলে তাকে ফাঁকি দেয়নি তো।

সিং-এর কাছে পাওয়া ঠিকানা নিয়ে হাজির হলাম ভরদ্বাজের নতুন বাড়িতে। বিরাট বাড়ি। গেটে দরওয়ান।

তার নির্দেশ মত এগিয়ে যেতেই একজন ভারিক্কি চেহারার কর্মচারী প্রশ্ন করল আমি কি চাই। বললাম ভরদ্বাজ সাহেবের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

'তিনি তো আগে নির্ধারিত না থাকলে কারও সঙ্গে কথা বলেন না।'

বললাম, 'আপনি গিয়ে বলুন দি সিটাডেলের সাগর সোম দেখা করতে চান এবং এটা জরুরী।'

কিছুক্ষণ পরে এক হালকা-পাতলা চেহারার মহিলা নেমে এলেন ওপর থেকে।

'আমি ভরদ্বাজ সাহেবের সেক্রেটারি। আপনি দেখা করতে চান? কেন?'

'সেটা তাঁকেই বলব।'

'তাহলে আসুন।'

'আপনার নামটা বলবেন?' যেতে যেতে বললাম।

'মীরা ভাট।'

মহিলাটি আমাকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে ভরদ্বাজ আসবেন বলে চলে গেল দরজা বন্ধ করে। লাইব্রেরীটা সস্তা বাজে ক্রাইম আর সেক্স সংক্রান্ত বইয়ে ঠাসা। একটা বই হাতে নিয়েছি এমন সময় হংস এল।

দুই বছর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। এরই মধ্যে বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে তার। বাড়ি, গাড়ি, দামী পোশাক।

কোন রকম সম্ভাষণ বা ভদ্রতা বিনিময় ছাড়াই প্রশ্ন করল সে, 'কি চাও?'

আমিও সরাসরি প্রশ্ন করলাম, 'কৈলাশ মাথুর কোথায়?'

'তাকে তোমার কি দরকার?'

'আমার দরকারের কথা শুনে তোমার লাভ হবে না। বলতে চাও না, বলবে না। আমি যাই।'

'যেয়ো না, বসো।' হুকুমই দিল সে।

কি একটা যেন ভাবল ভরদ্বাজ। তারপর বলল, 'সিটাডেল ছেড়েছ?'

'হাঁ। প্যাটেলের এটাই কৃতজ্ঞতা।'

'কি করছ?'

'কিছুই না। জমানো পয়সা ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি।'

'একটা কাজ আছে, ভাল কাজ। নেবে?'

'কি কাজ?'

'কৃপাল খুরানা দাঁড়াচ্ছে মেয়র ইলেকশনে। প্রচারের দায়িত্ব নেয়ার জন্য লোক দরকার। পাঁচ হাজার পাবে সপ্তায়।'

সে আরও বলল কৈলাশ মাথুর, দেবদাস সামন্ত, আর ওই মেয়েটার পেছনে ছুটে আমার লাভ হবে না। কৃপাল যদি জয়ী হয় আমি আরও অনেক বড় কাজ পাব।

আমি বললাম, 'একটু ভেবে দেখি। আমার লাঞ্চের ডেট আছে একজনের সঙ্গে ডায়মণ্ড রেস্তোরাঁয়।

সে হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'লাঞ্চ করবে তো রিমকি মেয়েটার সঙ্গে, তাই না?'

হংস ভরদ্বাজ কেমন করে জানে রিমকির খবর? আশ্চর্য হলাম।

'ঠিক আছে, ভেবে দেখো,' বলল সে। 'কাল ফোন করে জানাবে।'

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফিরে চললাম ডায়মণ্ড রেস্তোরাঁয়।

বারো

ওখানে পৌঁছে দেখি রিমকি আসেনি। এক পেগ হুইস্কি নিয়ে বার-এ বসে ভাবতে লাগলাম হংস ভরদ্বাজ আমাকে চাকরি দিতে চায় কেন। নিশ্চয় কোন মতলব আছে। কৈলাশ মাথুর যে তার সঙ্গে দেখা করেছে তাতেও সন্দেহ নেই।

রিমকি এল। এমন সেজেগুজে যে আমারই প্রথম চিনতে কষ্ট হলো।

একটা টেবিলে গেলাম। বললাম তাকে ভরদ্বাজের চাকরির প্রস্তাবের কথা। ভরদ্বাজদের মত লোকের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা নেই তা-ও বললাম।

মনোযোগ দিয়ে শুনে সে বলল, 'বেতনটা তো ভাল। কেন করবে না? তাছাড়া, কাজ তো করবে কৃপাল খুরানার হয়ে।'

'ভরদ্বাজ আর খুরানা একই জাতের লোক।'

'তাহলে তোমার চলবে কি করে?'

'তুমি আমার কথা ভাবছ?'

'ভাবব না কেন?' বলল সে আমার হাতে হাত রেখে।

'খুশি হলাম। আমার যা অভিজ্ঞতা আছে তাতে চাকরি একটা পাবই।'

'কিন্তু সপ্তায় পাঁচ হাজার খুরানা ছাড়া আর কে দেবে তোমাকে?' বলল সে গম্ভীর হয়ে।

এরপর নীরবে লাঞ্চ সারলাম দু'জনে। লাঞ্চের পরে চলে গেলাম এক পার্কে। একটা গাছের ছায়ায় বসে কাছে টানলাম তাকে। বললাম, 'রিমকি, আমরা বিয়ে করতে পারি না?'

হাসতে হাসতে সে বলল, 'হঠাৎ বিয়ের শখ? তা-ও বেকার অবস্থায়?'

'ঠিক আছে, চাকরি একটা জোগাড় করব। তার পরে?'

'চাকরিটা ভাল হওয়া চাই। তুমি কৃপাল খুরানার সঙ্গে দেখা করো না, শুধু আমাকে খুশি করার জন্য?'

'তোমার কি হবে? তুমি কি চাও না যে আমি তোমার বাবা, কৈলাশ মাথুর, আর তোমার মত দেখতে সেই মেয়েটাকে খুজে বের করি?'

'সাগর, ওদের কথা ভুলে যাও। তুমি আর আমি, এর মধ্যে আর কেউ থাকবে না। সুবল আর ডাক্তারের কথাও ভুলে যাও।'

ফিরে এলাম হোটেলে। উদ্বিগ্ন মুখে সুবল এসে বলল, 'হিটলার হারিয়ে গেছে। ভেবেছিলাম তোমার পিছনে গেছে।'

রিমকি বলল, 'না, যায়নি তো?'

ঘোষালও এল এসময়। জিজ্ঞেস করল হিটলারকে পাওয়া গেছে কিনা।

তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, 'কোথাও ঘুরতে গেছে হয়তো। অতবড় কুকুর, হারাবে না। ফিরে আসবে।'

একটু পরে ঘোষাল আর সুবলের ঘরে গিয়ে জানালাম 'রিমকি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছে। সে তার বাবা আর ওই নকল

রিমকিকে খোঁজার ব্যাপারে আগ্রহী নয়। সে তোমাদের দু'জনকেও ছাড়তে চায়। আমাকে কৃপাল খুরানার সঙ্গে দেখা করতে বলে।'

'কৃপাল খুরানা শুনেছি খুব খারাপ লোক। সকল গুণ্ডা-মস্তানের সর্দার। যেতে হলে সুবলকে সঙ্গে নিয়ে যান' বললেন ডাক্তার।

সুবল বলল, 'রিমকি এমন নিষ্ঠুর হয়ে গেল? আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমরা যাচ্ছি। তুমি নজর রেখো রিমকির ওপর।'

'রাখব,' বললেন ডাক্তার।

আমি আর সুবল রওয়ানা দিলাম কৃপাল খুরানার খোঁজে। সফদরজঙ্গ রোড পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই পড়ল এক শহরতলি এলাকা। এলাকাটা সুবলের চেনা। অপরাধ জগতের লোকদের আড্ডা হিসাবে কুখ্যাত জায়গা। সুবলও এক সময় ছিল এখানে। সে বলল, ট্যাক্সি ছেড়ে তার এক পুরানো স্যাঙ্গাতকে খুঁজবে একটু। লোকটার নাম হনুমান প্রসাদ। বীয়ার, চোলাই মদ, এসব বেচে।

হনুমান প্রসাদকে পাওয়া গেল। দোকানটা নোংরা এবং জরাজীর্ণ। লোকটা বলল, হাল অবস্থা খারাপ। রোজগার কম। পুরানো খদ্দেরদের অনেকে জেলে, কিংবা সটকে পড়েছে অন্য অঞ্চলে। তার কাছে পাওয়া গেল কৃপাল খুরানার খবর। বলল, 'মদ-মেয়ের কারবার করে কোটিপতি বনে গেছে খুরানা। হংস জুটেছে ওর সঙ্গে। ওদের এখন রমরমা অবস্থা।'

আমি ওর কথা শুনতে শুনতে রাস্তার দিকে তাকালাম। পরক্ষণেই সুবলকে, 'একটু আসছি' বলে দৌড় মারলাম। অতিকষ্টে টলতে টলতে ছুটছে আমাদের কুকুর হিটলার। ধরে ফেললাম তাকে। মাথাটায় এবং ঘাড়ে ক্ষত। রক্ত জমে আছে।

'হিটলার! কি হয়েছে তোর?'

'আমাকে নিয়ে সময় নষ্ট কোরো না। রিমকিকে ধরে নিয়ে গেছে ওরা। তোমার সঙ্গে লাঞ্চ খেতে যাবার পথে। ওখানে যার সঙ্গে লাঞ্চ করেছ সেই মেয়ে রিমকি নয়, অন্যটা...'

'অন্যটা? এ কি বলছিস হিটু? রিমকিকে কারা অপহরণ করেছে?'

হিটলার মুখ খুলল কথা বলার জন্য। কিন্তু বলতে পারল না। ঢলে পড়ল মাটিতে।

'হিটলার, বল কি হয়েছে,' কথার বদলে ঘেউ ঘেউ শব্দ বের হতে লাগল হিটলারের মুখ থেকে।

তেরো

গোটা ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হলো না। লাঞ্চের পর যাকে হোটেলে রেখে এসেছি সে রিমকি নয়। আসল রিমকিকে অপহরণ করা হয়েছে। হিটলার কথা বলার শক্তি হারিয়েছে। বলতে পারছে না কারা কোথা থেকে হামলা করেছিল তাদের ওপর। ছুটে গিয়ে ডেকে আনলাম সুবলকে হনুমান প্রসাদের দোকান থেকে। বললাম চাঁদনি চকের পেছনে সরকারী পশু হাসপাতালে নিয়ে যেতে। ট্যাক্সি নিয়ে ফিরলাম হোটেলে। ঘোষাল আর মেয়েটি নেই। বাইরে কোথাও গেল নাকি দু'জনে? ঘোষালের রুমে যেতেই এক অজানা আশঙ্কায় শিরশির করে উঠল গা। ফ্লোরে বলের মত গোল করে প্যাঁচানো অবস্থায় পড়ে আছে রিমকির ঝলমলে সালোয়ারটা। রক্ত মাখা। তাকে কি হত্যা করেছে কেউ? খুলে দেখলাম কোথাও বুলেটের ছিদ্র বা ছুরিতে কাটার চিহ্ন নেই। ডাক্তার পড়ে আছে বিছানায় চিত হয়ে। শার্ট-এর সামনের দিকটা রক্তে ভেজা।

'ডাক্তার, ডাক্তার, কি হয়েছে বলুন!'

ঘোষাল অতিকষ্টে চোখ খুললেন। ক্ষীণ স্বরে বললেন, 'ওটা রিমকি ছিল না। তুমি যাবার পরেই সে আমার ওপর চড়াও হয়। ...বিপজ্জনক...রিমকির খারাপ অংশটা...যা ভেবেছিলাম তাই। আমি

যাচ্ছি…হুঁশিয়ার থেকো…পুলিশ এর জন্য রিমকিকে ধরবে।… রিমকি কোথায় সাগর?'

'চিন্তা করবেন না। আমি এটা সামলাব। আপনার জন্য একজন ডাক্তার ডেকে আনি। ভাল হয়ে যাবেন।'

'রিমকিকে জড়াতে পারে এমন চিহ্ন রেখো না। খারাপ মেয়েটাকে ধরে ফেলো যেভাবে পারো…শেষ করে দাও…সে যেন রিমকির দেহে আবার মিশে যেতে না পারে…আগামী পূর্ণিমার পরে চেষ্টা করবে সে…'

তাঁর কথা ক্ষীণ হতে হতে বন্ধ হয়ে গেল। তিনি মারা গেলেন।

এসময় সুবল এল।

'ডাক্তার আর নেই, সুবল।'

সুবলের চোখে উন্মাদের দৃষ্টি। খপ্ করে আমার হাত ধরে সে বলল, 'কে ডাক্তারকে হত্যা করেছে বল্!'

এক ধাক্কা মেরে আমাকে সে ছুঁড়ে ফেলল দেয়ালের গায়ে। ডাক্তারের কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে লাগল হুহু করে। আমি নীরবে রিমকির রক্তমাখা সালোয়ারটি তুলে নিতে চাইলাম। সুবল ওটা কেড়ে নিল আমার হাত থেকে। প্রশ্ন করল রিমকি কোথায়। তাকে বলতে চাইলাম ডাক্তার কি বলেছেন মৃত্যুর আগে। কিন্তু সে শুনল না। তার বদ্ধমূল ধারণা রিমকিই খুন করেছে ডাক্তারকে। আমি রক্তমাখা সালোয়ারটা সরিয়ে রিমকিকে বাঁচাতে চাচ্ছি খুনের দায় থেকে। সে পুলিশকে ফোন করতে গেল। আমি রিসিভার কেড়ে নিলাম। বললাম এর পেছনে ভরদ্বাজের হাত রয়েছে। রিমকি করেনি এ কাজ। সে প্রশ্ন করল তাহলে রিমকি কোথায় গেল? বললাম, তাকে অপহরণ করা হয়েছে। সুবল মানল না। এমন সময় টেবিলে চাপা দেয়া একটা খাম

দু'জনের নজরে পড়ল। দু'জনেই ঝাঁপ দিলাম খামটা নেয়ার জন্য। সুবলের রাম ঘুষি খেয়ে পড়ে গেলাম। সে তুলে নিল খামটা। পড়ে বলল, ওটা আমার জন্য রেখে গেছে রিমকি। ওতে আমাকে বলেছে, ডাক্তারকে সে-ই খুন করেছে। এখন সে চলে যাচ্ছে। অবস্থা থিতিয়ে আসলে পরে যোগাযোগ করবে। চিঠিটা পকেটে রাখল সুবল।

তাকে অনেক বোঝাতে চেষ্টা করলাম। ডাক্তার কি বলেছে, হিটলার বাকশক্তি হারাবার আগে কি বলেছে সবই বর্ণনা করলাম। কিন্তু সুবলের এক কথা, রিমকিই খুনী।

আমার এখন কি কর্তব্য? সালোয়ারটা এবং চিঠিটা ধ্বংস করা। লাফিয়ে পড়লাম সুবলের ওপর। সুবল মিনিটের মধ্যে কিল ঘুষি মেরে আমাকে শুইয়ে দিল ফ্লোরে। আমার নাক-মুখ রক্তাক্ত হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম।

'দুঃখিত, তোমার দোষেই মারটা খেলে। তোমার ওপর আমার রাগ নেই। তবে রিমকিকে ছাড়ব না,' বলল সুবল।

একটু পরেই এল দারোগা রামচাঁদের নেতৃত্বে পুলিশের দল। সুবলের সঙ্গে কথা বলে এল আমার কাছে।

আমাকে দেখে বিস্মিত হলো রামচাঁদ। 'কি হে সাগরবাবু, মারামারি করছিলে নাকি?'

'রাম বলো, রাম বলো, মারামারি করব কেন? একটু দোস্তির আলাপ করছিলাম।'

'রসিকতা রাখো। বলো, এ খুনের সঙ্গে তুমি কতটা জড়িত।'

বললাম ত্রিপুরা রাজ্যে ঘোষাল আর সুবলের সাথে পরিচয়ের কথা। কিন্তু রিমকির কথা বললাম না।

'রিমকি সামন্তের ব্যাপারে কি জানো?'

'কোন্ রিমকি? রিমকি তো দু'জন।'

'দু'জন মানে?'

'বসলে বুঝিয়ে বলতে পারি। সময় লাগবে।'

'চালাকি চলবে না। সত্য কথা হওয়া চাই,' বলল রামচাঁদ।

আমি বললাম। ত্রিপুরার ঘটনাবলী থেকে আরম্ভ করে সবকিছু। রিমকিকে কারা অপহরণ করেছে এবং তার অন্য অর্ধাংশ ঘোষালকে খুন করেছে, বলে বক্তব্য শেষ করলাম।

রামচাঁদ বলল এ কাহিনী কোন বিচারকের সামনে পেশ করা যাবে না। 'তোমাকে জানি সাগরবাবু, নইলে এখনি হাতকড়া পরাতাম। তোমার গল্পটা পাগলেও বিশ্বাস করবে না।'

সুবলকে দেখিয়ে বললাম, 'এ সাক্ষী আছে। এ বলবে কাবাব, সবাক কুকুর, ভাসমান নারী সবই সত্য।'

কিন্তু সুবল বলে দিল সবই মিথ্যা, বানোয়াট গল্প। রিমকিকে বাঁচানোর জন্য।'

'তোমরা দু'জনই যাবে আমার সঙ্গে। দেখি ওসি সাহেব কি বলেন।'

একটা স্ট্রেচারে তুলে ঘোষালের দেহটা নিয়ে গেল পুলিশরা।

চোদ্দ

ওসি অর্জুন মেহরা রগচটা হলেও মানুষ ভাল। আমার সঙ্গে অনেক দিনের পরিচয়।

আমাকে দেখেই বললেন, 'কি ব্যাপার, আপনি কিভাবে জড়ালেন এর মধ্যে?'

বললাম যে আমি জড়াইনি। রামচাঁদজী জড়াতে চান কিনা, বুঝতে পারছি না।

'কিন্তু খুনী মেয়েটা যে আপনাকে চিঠি লিখে গেল?'

'খুন সে করেনি। চিঠিও সে লেখেনি। এসব অন্য মেয়েটির কাজ।'

'ও, হ্যাঁ, রামচাঁদ বলেছে। কাবাব, সবাক কুকুর, ভাসমান মেয়ে—এসব তো? রামচাঁদের সঙ্গে এসব রসিকতা চলে বলে আমার সঙ্গেও চলবে?'

'আমাকে বিশ্বাস না হলে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করুন না।'

'করব ধরতে পারলে। সুবল লোকটা উল্টো কথা বলে।'

'অর্জুনজী, সুবলের কথায় কান দিবেন না। তার বদ্ধমূল ধারণা খুনটা রিমকি করেছে।

'মেয়েটি খুন করেনি এ কেবল আপনি বলছেন। আর সবাই নিশ্চিত

যে খুনটা সে-ই করেছে। কাজেই যা বলবেন সাবধানে বলবেন মি. সোম।'

'আমার যা বলার বলতে পারি। কিন্তু আপনি বিশ্বাস করবেন না।'

'ঠিক আছে বলুন, শুনি আপনার মুখ থেকে।

'গোটা কাহিনীটা বললাম।

শুনে অর্জুন মেহ্‌রা বললেন, 'কুকুরটা তাহলে কথা বলে? একটা খাঁটি এবং আসল কুকুর? ওটা এখন কোথায়?'

'সুবলকে জিজ্ঞেস করুন। সে ওটাকে দিয়ে এসেছে পশু হাসপাতালে।'

'সুবল তো বলে ওটা কখনও কথা বলেনি। ঠিক আছে। রাম, খোঁজ করত কুকুরটার?'

রামচাঁদ চলে গেল।

'দুঃখিত, অর্জুনজী, কুকুরটা গতকাল পর্যন্তও কথা বলেছে। মাথায় আঘাত লাগার পর বোবা হয়ে গেছে।'

'মেয়েটাও বোধ হয় আর বাতাসে ভাসে না। আপনাকে জানি অনেক দিন থেকে। নইলে আমার মেজাজ বিগড়ে যেত।'

'অর্জুনজী, আপনি একজন স্পোর্টসম্যান। ঝুঁকি নিতে জানেন। তাই বলছি, প্রমাণ করার একটা সুযোগ দেন। মেয়ে দু'টিকে আপনার সামনে হাজির করতে পারলে আপনার বিশ্বাস হবে।'

'কিভাবে হাজির করবেন?'

'দু'সপ্তাহ সময় দিন। আপনার লোকরা আমার পেছনে না লাগলে আমি পারবই।'

'কাগজওয়ালা কি বলবে? হইচই বাধিয়ে দেবে না?'

বললাম, ওই পেশার লোক হিসাবে জানি যে ইচ্ছা করলে কাগজওয়ালাদের ঠেকিয়ে রাখার কায়দা তিনি জানেন। 'অর্জুনজী, খুন ছাড়া আরও বড় কিছু আছে এর পিছনে। রিমকিকে যদি খুনের দায়ে আটক করেন তাহলে অপরাধের ওই বড় কারবারীরা বেঁচে যাবে।'

'কোন বড় কারবারীরা?'

'সেটা আমি বলব সময় হলে।'

'এক সপ্তাহের সময় দিলাম। এর মধ্যে মেয়ে দু'টিকে হাজির করতে না পারলে ওয়ারেন্ট জারি হবে আপনার বিরুদ্ধে। আমাকে না জানিয়ে দিল্লীর বাইরে যাবেন না।'

'ঠিক আছে, ওসি সাহেব,' বলে বেরিয়ে এলাম।

এসময় দারোগা রামচাঁদের সঙ্গে দেখা। 'মাথায় আঘাত পাওয়া একটা কুকুরকে চাঁদনির পশু হাসপাতালে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু ডাক্তাররা তার জন্য কিছু করার আগেই কুকুরটা পালিয়ে গেছে। তোমার কুকুরটাই হবে।'

'হতে পারে,' বলে রাস্তায় নেমে ট্যাক্সির কথা ভাবতেই একটা ট্যাক্সি এসে থামল সামনে। দরজা খুলে ভিতরে বসেই দেখলাম কোণের দিকে একটি মেয়ে।

'চুপচাপ বসে থাকুন রিপোর্টার সাহেব। কথা আছে আপনার সঙ্গে,' বলে উঠল মেয়েটি। হংস ভরদ্বাজের সেক্রেটারি মীরা ভাট। হাতে একটা ছোট্ট পিস্তল।

বললাম, 'সুন্দরী, আমাকে কিডন্যাপ করার দরকার কি? আমি তো আপনার ইশারায় যেকোন জায়গায় যেতে রাজি।'

'ভরদ্বাজজী দেখা করতে চান,' বলল মীরা।

'তাই নাকি? বেশ ভাল কথা। আমিও তার দেখা পেতে চাই। জানেন, সে আমাকে চাকরি দিতে চায়?'

জবাব না দিয়ে পিস্তলটা আরও শক্ত করে ধরল সে।

'থানার সামনে থেকে আমাকে তুলে নিয়ে বোকামিই করলেন মনে হচ্ছে। আমাকে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। পুলিশ যে আমার পিছু নেবে এটা নিশ্চিত। আমাদের দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক আছে একথা পুলিশের জেনে যাওয়া খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।'

ঘাবড়ে গেল মীরা আমার কথা শুনে। পুলিশ সত্যি অনুসরণ করছে কিনা দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে তাকাতে লাগল পেছন দিকে। এ সুযোগটা গ্রহণ করলাম। বিদ্যুৎগতিতে হাত বাড়িয়ে ওর পিস্তলটা কেড়ে নিলাম। ড্রাইভারকে বললাম আমাদের হোটেলের দিকে যেতে। ড্রাইভার ওদেরই লোক। আমার কথা কানে নিল না। মীরাকে বললাম পেছনের দিকে তাকাতে। এবার তাকিয়ে সে দেখল, সত্যি একটা কালো এ্যাম্বাসাডর আসছে আমাদের পিছনে। মীরার চোখে ভয়ের চিহ্ন দেখে বললাম, 'আমি একটা খুনের মামলায় জড়িয়ে পড়েছি। পুলিশ যদি টের পায় যে ভরদ্বাজেরও সম্পর্ক আছে এ খুনের সাথে, তাহলে তাকে ছিঁড়ে ফেলবে পুলিশ।'

মীরা ভড়কে গেল। ড্রাইভারকে বলল আমার নির্দেশ মত গাড়ি চালাতে। সে তাই করল। হোটেলের সামনে আসতেই বললাম থামাতে। মীরা ভাটকে বললাম নামতে। তার সঙ্গে একটু কথা বলব। পরে আমিও যাব ভরদ্বাজের সঙ্গে দেখা করতে।

তাকে নিয়ে রুমে গিয়ে বললাম বসতে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম রাস্তার ওপাশে কালো গাড়িটাতে বসে একজন তাকিয়ে আছে

এদিকে। জানালাটা বন্ধ করে দিলাম।

'কি কথা বলবে?' ক্রুদ্ধভাবে প্রশ্ন করল মীরা।

'আজ বিকালে ঘোষালকে হত্যা করেছে এক নকল রিমকি সামন্ত।'

'খুন করেছে রিমকি সামন্ত,' বলল মীরা।

'রিমকি কোথায়?'

'ভরদ্বাজজীর কাছে।'

'নকলটি?'

'নকল রিমকি কেউ নেই।'

প্রশ্ন করলাম রিমকিকে নিয়ে ভরদ্বাজ কি করতে চায়, প্রশ্ন করলাম এর সাথে কৃপাল খুরানার সম্পর্ক কি। জবাব না পেয়ে একটা ঘুষি লাগালাম তার চোয়ালের ডান পাশে। সে সংজ্ঞা হারাল। চোখের পাতা উল্টে বুঝতে পারলাম জ্ঞান ফিরতে দেরি হবে। ঠিক আছে, ভরদ্বাজ রিমকিকে পেয়েছে, আমি তার সেক্রেটারিকে পেয়েছি। বদলাবদলি করা যাবে।

বাথরুমে গিয়ে আঠালো টেপ-এর একটা রল নিয়ে এলাম। তার মুখে রুমাল গুঁজে টেপ দিয়ে বন্ধ করলাম। হাত আর পায়ের গোড়ালিতে শক্ত করে টেপ লাগালাম।

পেছন দিকে হোটেল থেকে বের হবার একটা ছোট্ট দরজা আছে। সবার চোখ এড়িয়ে সংজ্ঞাহীন মীরাকে কাঁধে ফেলে বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু সামনে-পেছনে টিকটিকিরা পাহারা দিচ্ছে। কি করব ভাবতে ভাবতে রিমকির রুমে গিয়ে ওর আদলে গড়া একটি লাইফ-সাইজ পুতুল পেলাম। ম্যাজিক দেখাতে ওটা কাজে লাগে বলে সে বানিয়ে নিয়েছিল। পুতুলটাকে তুলে এনে বসিয়ে দিলাম মীরা ভাটের

পাশে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, যে গোয়েন্দাটি গাড়িতে বসে আছে সে রামচাঁদ নয়, অপরিচিত একজন, রামচাঁদের বদলী। এ আমাকে চিনবে না। তবু পোশাক বদলে ফেললাম। রুমে ছোট্ট গোল টেবিলটার খুঁটিগুলো খুলে নিলাম স্ক্রু-ড্রাইভার দিয়ে। মীরার দুই হাঁটুর পিছনে একটা করে দেড় ফুটি খুঁটি বেঁধে দিলাম টেপ দিয়ে। বাকি দুটো বেঁধে দিলাম দু'পায়ের সঙ্গে। আরও লম্বা কয়েকটা স্ক্রু খুঁজে এনে তার জুতোগুলো আটকে দিলাম টেবিল-টপের সঙ্গে। পোশাকের দোকানে মোমের মডেলগুলোর মত দাঁড়িয়ে রইল মীরা। বিছানার একটা চাদর তার কোমরে পেঁচিয়ে ঢেকে দিলাম। রিমকির ডামিটাকেও ঠিক তাই করলাম। তাকিয়ে দেখলাম কোন্‌টা ডামি, কোন্‌টা নয়, বোঝা কঠিন।

এখন আসল কাজ। হোটেলের দুই অংশ। পূর্ব ও পশ্চিম। লম্বা করিডোর দিয়ে দুই অংশ যুক্ত। আমরা থাকি পশ্চিম অংশে। ভাবলাম সামনের সিআইডির লোকটাকে আমার পোশাক আর আকৃতির বর্ণনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু পোশাক আমি বদলে ফেলেছি। চুলও নামিয়ে দিয়েছি কপালের অর্ধেক পর্যন্ত। তবু, পুবের অংশের পেছনের দরজা দিয়ে বের হব। মীরার জুতার স্ক্রু খুলে নিলাম। তাকে এক বগলে, ডামিটাকে এক বগলে চেপে কোনরকমে রাস্তায় নামলাম। চকিত দৃষ্টিতে দেখলাম পশ্চিম দিকে রাস্তা থেকে এক টিকটিকি ধীর পায়ে আসছে। সন্দেহ করে নয়, শুধু কি হচ্ছে দেখতে। আমি তার দিকেই এগিয়ে গেলাম। লোকটা থেমে গেল। সামান্য দ্বিধা করে ফিরে গেল তার আগের জায়গায়। বুঝলাম আক্রমণই আত্মরক্ষার সেরা উপায়।

একটা ট্যাক্সি থামালাম। একজন টহলদার পুলিশ যাচ্ছিল, তাকে

ডাক দিলাম, 'হাবিলদার সাব? (পুলিশটা কনস্টেবল মাত্র) একটু সাহায্য করবেন?' কাছে আসতেই তার হাতে গুঁজে দিলাম বিশ রুপীর একটা নোট। গদগদ হয়ে পুলিশটি বলল, 'কি সাহায্য বলুন। নিশ্চয়ই করব।'

'একটা মজা করতে যাচ্ছি এক বন্ধুর সঙ্গে। এই ডামি দুটোকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেব তার বিছানায়। অফিস থেকে ফিরে এগুলো দেখে তার কি অবস্থা হয় দেখব লুকিয়ে। সে আমার সঙ্গে একদিন যে ঠাট্টা করেছিল এটা হবে তার জবাব।'

অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল পুলিশটি। হাসি থামতে তার হাতে রিমকির ডামিটা দিয়ে বললাম, 'এটাকে একটু তুলে দিন ট্যাক্সিতে।' আমি মীরাকে তুলে নিলাম।

এ সময় আগের সেই টিকটিকিটার সন্দেহ হলো। সে এসে প্রশ্ন করল, 'কি হচ্ছে এখানে?'

'আরে শিউচরণ যে,' বলল কনস্টেবলটি। 'এখানে আমার বীটে কি করছ?'

'বিশেষ দায়িত্বে আছি। চাদরে ঢাকা এগুলো কি?'

টহলদার পুলিশটাকে বললাম, 'দেখিয়ে দিন না। তাঁর সন্দেহ যখন জেগেছে।'

'আরে বোকারাম, এগুলো হচ্ছে মোমের ডামি।'

'ডামি বলে বুঝলে কি করে?'

'আরে বুদ্ধু, ডামি না তো লাশ নাকি?'

এ সময় মীরা নড়ে উঠে অস্পষ্ট ঘোঁৎ শব্দ করল। সাদা পোশাকের পুলিশ আর টহলদার পুলিশ দু'জনই কান খাড়া করে ফেলল।

'অতিরিক্ত শশা খেয়েছিলাম তো। পেটে একটু বাতাস হয়েছে।'

'এগুলো ডামি হলে দেখাও না,' বলল শিউচরণ।

হঠাৎ চটে যাবার ভান করে রিমকির ডামিটা টেনে নিয়ে বললাম, 'বড় জ্বালাতন করছেন। দেখুন ডামি না হাতি।'

একটু টিপে দেখেই পিছিয়ে গেল শিউচরণ। মীরাকে ট্যাক্সির ভিতর ঠেলে দিয়ে আমিও উঠে পড়লাম। ড্রাইভার ট্যাক্সি স্টার্ট দিল। মীরা আবারও ঘোঁৎ করে শব্দ করল।

'শশাটা বড্ড বেশি খেয়েছেন বাবুজী,' বলে গতিবেগ বাড়িয়ে দিল ড্রাইভার।

পনেরো

হংস ভরদ্বাজের দরওয়ান বা আর কেউ এবার আমাকে কোন প্রশ্ন না করেই সরাসরি নিয়ে গেল তার কাছে।

'মীরা কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'রিমকি কোথায়?' আমার পাল্টা প্রশ্ন।

হঠাৎ হাসল হংস। 'খুব চালাকি করেছ। যাই হোক, আমরা একটা চুক্তিতে আসতে পারি।'

'তাই হওয়া ভাল। রিমকিকে আমার হাতে তুলে দাও। মীরাকে তুমি পাবে।'

'রিমকি আমার কাছে থাকলে অবশ্যই ফিরিয়ে দিতাম। কিন্তু সে পালিয়ে গেছে।'

'তাহলে মীরাও হয়তো পালিয়ে যাবে।'

'আমি পুলিশ ডাকতে পারি,' বলল হংস।

'ডাকতে পারো, ওরা খুশি হবে তোমাকে দেখে।'

'রিমকিকে পেলে কি করবে? তাকে তো পুলিশ খুঁজছে।'

'সেটা আমি দেখব। ওকে দাও আমার হাতে।'

ঠিক এ সময় দরজা খুলে গেল। মীরা ভাট প্রবেশ করল। আমি বিস্ময়ে থ খেয়ে গেলাম। দেখলাম তার চোয়ালটা ফোলা ; কালসিটে দাগ পড়ে গেছে।

মীরা সোজা আমার কাছে এসে একটা লাথি মারল আমার পাঁজরে তার জুতার সরু অগ্রভাগ দিয়ে। 'কুত্তা, তোকে আমি খুন করে ফেলব,' বলল সে সাপের মত হিসহিসিয়ে। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম ফ্লোরে। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই আরেক ষণ্ডা গোছের লোক মারল এক ঘুষি। আবার গড়িয়ে পড়লাম।

'হয়েছে, আর মেরো না। আমি কথা বলতে চাই তার সঙ্গে,' বলল হংস।

মীরা বলল আমি তার হাত-মুখ-পা টেপ লাগিয়ে বন্ধ করে শহরতলির এক খালি গুদামে রেখে আসি। তার গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনতে পায় কয়েকটি ছোট্ট ছেলে। ওরা টেপ খুলে তাকে মুক্ত করে।

ভরদ্বাজ কুটিল হাসি হেসে মন্তব্য করল যে আমাকে যতটা চালাক ভেবেছিল ততটা নই দেখে সে খুশি। বলল, 'এই রিমকি সামন্ত মেয়েটা তার কাছে আছে।'

'অন্যটাও আছে তোমার কাছে?'

'কিমরির কথা বলছ?'

'কিমরি?'

'কেন হবে না? সে রিমকির ঠিক উল্টো। তোমারটা ভাল মেয়ে।'

'জানি। এখন কি করতে চাও, বলো।'

'দেখো, কিমরির কথা আমি শুনি কৈলাসের কাছে। কৈলাসকে ৫০ হাজার রুপী না দিয়ে ঠকিয়েছে। আমি কৈলাসের কাছ থেকে খোঁজ

নিয়ে বের করেছি কিমরিকে। দারুণ মেয়ে একখানা। সে আমাকে বলে তোমার কথা, ত্রিপুরায় কি ঘটেছে সেই কাহিনী। কিন্তু মেয়েটা অস্থির। কোথায় যায় কি করে বলা যায় না। ঘোষালকে খুন করাটা তার দরকার ছিল না। রিমকিকে অপহরণ করিয়েছি আমি। কিমরি যায় তোমার সঙ্গে লাঞ্চ করতে। সে বলেছিল তোমাকে কৃপাল খুরানার জন্য কাজ করতে রাজি করাবে। এখন তুমি যদি আমার কথা মত কাজ করতে রাজি না হও, রিমকিকে তুলে দেব পুলিশের হাতে।'

'কি কাজ করব?'

'প্যাটেল সাহেব তোমাকে দি সিটাডেল-এ ফিরিয়ে নিতে চায়। তুমি যাও। তাঁর হাতে এক সেট ফটো আছে। ফটোগুলো কৃপালের। মাস কয়েক আগে কৃপাল এক মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছিল। এক ধুরন্ধর লোক ওই সময় তার কিছু নগ্ন ছবি তুলে নেয় গোপনে। প্যাটেল ছবিগুলো নির্বাচনের আগে ছাপতে চান। ছাপা হলে খুরানার সর্বনাশ হবে। তুমি ওই ছবিগুলো হাতিয়ে আনবে, আমি রিমকিকে ফেরত দেব।'

'একটা হলে চলবে না। আমি ওদের দু'জনকেই চাই। রিমকিকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে হলে কিমরিকেও পুলিশের কাছে দিতে হবে।'

ভরদ্বাজ বলল, 'আপত্তি নেই। আমি চাই ফটোগুলো।'

'রাজি আছি,' বলে উঠে দাঁড়ালাম। 'এখনি যাব প্যাটেল সাহেবের কাছে।'

'আমার সঙ্গে চালাকি কোরো না। ভাল হবে না।'

পনেরো মিনিটের মধ্যে চলে গেলাম প্যাটেলের অফিসে।

'তুমি তাহলে ফিরে এসেছ। অযোগ্য, অকর্মা, গর্ধব কোথাকার!

নিজেকে আবার খবরের কাগজের লোক, বিশেষ করেস্পণ্ডেন্ট বলে জাহির কর...'

'প্যাটেলজী, আপনি বলেছিলেন রেগে যাবেন না,' বলল তাঁর সেক্রেটারি কৃষ্ণা চৌহান।

'রাগব না? লাখ রুপী নষ্ট করিয়েছে পত্রিকার। অথচ তার ভাবখানা দেখো যেন কিছুই হয়নি!'

'ওটা আমার দোষ নয়, স্যার। জিজ্ঞেস করুন শেঠকে। সে বলবে কি ঘটেছিল। আপনাকে ধোঁকা দেয়া হয়েছে। দোষ দেবদাস সামন্তের।'

'ধোঁকা দিয়েছে ঠিক। কিন্তু তুমি কি করলে? তোমার ওই ভাসমান মেয়ে, কথা বলা কুকুর, মনুষ্য কাবাব আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?'

'ওসব বাদ দেন স্যার। আমি খুরানার ব্যাপারে কথা বলতে চাই। আমি জানি ফটোগুলোর কথা। ভরদ্বাজ ওগুলো পেতে চায়। ভরদ্বাজ দেবদাসের মেয়েকে খুনের মামলার ফাঁদে ফেলেছে। ফটোগুলো না পেলে মেয়েটাকে তুলে দেবে পুলিশের হাতে। সে চায় আমি যেন ফটোগুলো আপনার কাছ থেকে নিয়ে তাকে দি। তখন সে মেয়েটাকে ছেড়ে দেবে।'

'কি বললে? ফটোগুলো তোমাকে দেব? হংস বদমাশ দুনিয়ার সব মেয়েকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিলেও ফটো তুমি পাবে না।'

'প্যাটেলজী, সব কিছু আপনাকে খুলে বলতে চাই, শুনবেন দয়া করে?'

'শুনব,' বললেন তিনি।

রিমকির সাথে দেখা হবার পর থেকে আরম্ভ করে হংস ভরদ্বাজের

সাথে সর্বশেষ সাক্ষাৎ পর্যন্ত সব ঘটনা বললাম।

শুনে তিনি বললেন, 'তোমাকে আমি পাগলা গারদে পাঠাব।'

'এ সময় দরজায় খুটখুট শব্দ হলো। কৃষ্ণা চৌহান বলল, আসুন।'

দরওয়ান গণেশ থাপা এসে দাঁড়াল ভিতরে। তার চোখে-মুখে মহা আতঙ্কের ছাপ। সে বলল, চাকরি ছেড়ে দেবে।

'চাকরি ছেড়ে দেবে? কি বকছ তুমি। আমার ষোলো বছরের বিশ্বাসী দরওয়ান তুমি। তুমি বললে এই কথা?' হুঙ্কার দিলেন প্যাটেল।

'বাবুজী, চাকরি ছাড়লে না খেয়ে মরব। তবুও ছাড়তে হবে। কারণ আমার মাথাটা বিগড়ে গেছে।'

'কি করে বুঝলে?'

'সকালেও মাথাটা ঠিক ছিল। একটু আগে বুঝলাম মগজটা খারাপ হয়ে গেছে।'

'কেমন করে বুঝলে?'

'একটা বড় কুকুর গেটে এসে আমাকে প্রশ্ন করল আমি প্রতিদিন আমার আণ্ডারওয়্যার বদলাই কিনা।'

'কুকুর? কোথায় গেল। এ তো হিটলার! এর কথাই আমি বলছিলাম,' বলে ছুটে নেমে এলাম নিচে। গেটের কাছে লোকের জটলা, কিন্তু হিটলার নেই। ওরা বলল, একটা কুকুরকে ডানদিকে চলে যেতে দেখেছে।

ট্যাক্সিতে উঠে হুকুম দিলাম রাস্তার ফুটপাথ ঘেঁষে যেতে।

আমাদের হোটেলের কাছাকাছি এসে ধরলাম হিটলারকে। তার অবস্থা এখন মোটামুটি ভাল, শুধু মাথার ঘাটা দগদগ করছে।

হিটলারকে তুলে নিলাম পেছনের সীটে। কথা বলতে লাগল আমার

সঙ্গে। কুকুরকে মানুষের মত কথা বলতে শুনে ড্রাইভারের মূর্ছা যাবার অবস্থা। হঠাৎ ব্রেক কষে ট্যাক্সি থামিয়ে ফেলল। বলল, 'কুকুরটা কথা বলছে!'

'বলছে, বন্ধু। এসবে কান না দিয়ে তুমি চালিয়ে যাও।' গাড়ি আবার চলতে লাগল।

'আমার বাকশক্তি হঠাৎ চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে পেয়েছি। আমরা সময় নষ্ট করছি। আমি জানি রিমকি কোথায় আছে। তাকে ভরদ্বাজের গুণ্ডাটা, যে আমাকে মেরেছিল সে, হনুপ্রসাদের চোরাই মদের দোকানের ওপর তলায় আটকে রেখেছে।'

ষোলো

হনুমান প্রসাদের দোকানে যাওয়ার পথে হিটলার আমাকে বলল, রিমকির অপহরণ সে দেখেছে। গুণ্ডাটার গাড়ির পেছনে সে ছুটে যায়। কিন্তু হনুমান আর গুণ্ডাটি মিলে তাকে আঘাত করে। অতিকষ্টে সে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে।

দোকানের সামনে ট্যাক্সি থেকে নামলাম। বললাম, 'হিটলার, তুমি বাইরে থেকে নজর রাখো বাড়িটার ওপর। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি বেরিয়ে না আসলে পুলিশদের খবর দেবে।'

দোকানটায় কেউ নেই। কাউন্টারে একটা ছেলে বসে বসে ঘুমাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হনুমান কোথায়?'

হাই তুলে ছেলেটি বলল, 'নেই। বাইরে গেছে।' আবার দু'বাহুতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল সে। সিঁড়ি দরজাটায় ঠেলা দিলাম আস্তে। খুলে গেল। নিঃশব্দে উঠে গেলাম দোতলায়। আমার সঙ্গে একটা পিস্তল রয়েছে। তাই মনে জোর পেলাম। প্রথম রুমটা খালি। একটা খাট ছাড়া আর কিছু নেই। দ্বিতীয় রুমটা তালাবদ্ধ। কিন্তু দরজায় জোরে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল তালাটা। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম রুমটার মধ্যে।

'শেষ পর্যন্ত এলে তুমি?' রিমকির কণ্ঠস্বর। সে উঠে বসার চেষ্টা

করছে বিছানায়। হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালি বেঁধে রাখা হয়েছে। পকেট থেকে ছোট্ট ছুরিটা বের করে কেটে দিলাম বাঁধন। সে মুক্ত হলো। রুমটা খালি। একটা টেবিল ছাড়া আর কিছু নেই। টেবিলে একটি অদ্ভুত ধরনের যন্ত্র। দুটো বড় আকারের স্প্রিং, লম্বা শেকলে আটকানো একটা হ্যাণ্ডকাফ, দু'একটা দাঁতওয়ালা চাকা। সবগুলো একসাথে যুক্ত।

'এটা কি?' জিজ্ঞেস করতেই চেঁচিয়ে উঠল সে, 'ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওটাকে।'

'মানুষ আটকানোর ফাঁদ নাকি এটা?' বলে হাত দিতেই খট করে একটা আওয়াজ হলো। স্প্রিংগুলো সামনে লাফ দিল। চাকাগুলো ঘুরে গেল এবং আমার হাতের কব্জিতে হ্যাণ্ডকাফ লেগে গেল।

রিমকি নামল খাট থেকে। 'বললাম ছুঁয়ো না। এখন কি করবে?'

শান্তকণ্ঠে বললাম, 'খুলে ফেলব।'

কেঁদে ফেলল রিমকি। বলল, ওটা খোলা যাবে না। তার কথাই ঠিক। অনেক চেষ্টা করেও খোলা গেল না।

শেষে মরিয়া হয়ে দু'হাতে শেকলটা ধরে লাফ দিলাম পিছন দিকে। তাতেও কিছু হলো না।

'ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে!'

তাকে বললাম, 'শোনো, রিমকি, তোমাকে ওরা এক মহা বিপদে ফেলে দিয়েছে।' সংক্ষেপে তাকে ঘোষালের হত্যা, পুলিশের খোঁজাখুঁজি ইত্যাদি বললাম। 'কাজেই, তোমাকে কোথাও এখন লুকিয়ে থাকতে হবে। চলে যাও। হিটলারকে নিয়ে যাও। তাকে বলে দিয়ো তুমি কোথায় থাকবে।'

চেঁচিয়ে উঠল সে, 'না। তোমাকে ছেড়ে আমি যাব না।'

থরথর করে কাঁপতে লাগল সে। বলল, 'আমার মধ্যে কি যেন একটা হচ্ছে।'

তার চোখের দৃষ্টি আমাকে ভড়কে দিল। তোমরা বিশ্বাস করবে না। আমার চোখের সামনে রিমকি ঝাপসা হয়ে গেল···হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আমার সামনে একটা স্বচ্ছ ছবির মত জিনিস। রিমকির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে ছায়া মূর্তি। দেখতে দেখতে ওটা রিমকির মত হয়ে গেল। রিমকিও স্বচ্ছতা হারাল।

বুঝলাম ছায়ামূর্তি হয়ে যে বেরিয়ে এসেছে সে দ্বিতীয় জন, কিমরি। রিমকি আমারি মত ভড়কে গিয়ে পিছনে সরে গেল। বলল, 'তুমি আমার আণ্ডারওয়্যার পরে আছ!'

'পরব না? ন্যাংটো হয়ে বের হব নাকি?' বলল কিমরি।

'কিন্তু···তুমি তো আমিই!' বলল রিমকি।

'নিশ্চয়ই, শরীর তো দু'জনের একটাই।'

'কি মুশকিল! আমি কি করব?' বলল রিমকি দু'হাতে মুখ ঢেকে।

'অভ্যাস হয়ে যাবে। প্রত্যেক মানুষের স্বভাবে দুটো দিক থাকে। মুংখ্রা আমাদেরকে আলাদা করে দিয়েছে। এতে আমি খুশি। আলাদা হয়ে চলতে পারি,' বলল কিমরি। 'তবে আমি তোমার অংশ মাত্র। সিদ্ধান্ত নিয়েছি তোমাকে ছেড়ে যাব।'

'তুমি খারাপ, নষ্ট,' বলল রিমকি।

'তাই ভাল। তোমার মত গোবেচারি হয়ে থাকতে চাই না।'

'ঠিক আছে, তোমাকে আমার মধ্যে ঢুকতে আর দেব না!'

'আমিও ঢুকব না। তবে ইচ্ছা হলে যখন খুশি ঢুকতে পারব। আমি

না থাকলে তুমি পেট চালাবে কেমন করে?'

'সেটা আমি পারব। তোমাকে আর চাই না।'

'ঠিক আছে। তোমার মধ্যে ঢোকা এখন নিরাপদও নয়,' বলল কিমরি।

'তার মানে?'

'ঘোষাল বুড়োটাকে খুন করেছি। ভরদ্বাজ বলল আমাকে লুকিয়ে রাখবে। পুলিশ খুনের দায়ে তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলালে আমি নতুন জীবন শুরু করব। তুমি আমাকে ইচ্ছামত কাজ করতে দাও না। কতদিন হয়ে গেল তুমি একটি পকেটও মারোনি। এটা জীবন হলো?'

গর্বিত ভঙ্গিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়াল কিমরি। 'সাগর, এসব ঝামেলা মিটে গেলে তোমার প্রতিশ্রুতি মত আমাকে বিয়ে করবে তো?'

'ওরে ছিনাল! সাগর আমাকে ভালবাসে,' ফোঁস করে উঠল রিমকি।

'আরে ধুর, এটা তুই ভাবিস। সাগর আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।'

'খবরদার! সাগরকে নিয়ে টানাটানি করলে তোকে আমিই ধরে নিয়ে যাব পুলিশের কাছে!' বলল রিমকি।

'না, না,' বলে কিমরি ছুটে পালাল দরজা খুলে।

পর মুহূর্তে ভরদ্বাজের গুণ্ডাটি দেখা দিল খোলা দরজার মুখে। রিমকি হুস্ করে ভেসে উঠে গেল সিলিং-এর কাছে। আমি মরিয়া হয়ে লাথি মারলাম টেবিলটায়। টেবিল উল্টে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রটি চালু হয়ে গেল। ঘর্ঘর শব্দে চাকাগুলো ঘুরল। হ্যাণ্ডকাফ খুলে পড়ল। গুণ্ডাটি লাফ দিয়ে পড়ল আমার ওপর। রিমকি ওপর থেকে তার ঝাঁকড়া চুল ধরে দিল হেঁচকা টান। ওপর দিকে তাকিয়েই গুণ্ডাটি আতঙ্কে স্থির হয়ে

গেল। এ সুযোগে আমি তার চোয়ালে লাথি মারলাম। সে শুয়ে পড়ল ফ্লোরে।

'এক মুহূর্ত দেরি নয়। চলো, বেরিয়ে যাই,' বলে রিমকিকে টেনে নামালাম নিচে। সে শোলার মত হালকা হয়ে গেছে। এদিকে সিঁড়িতে আরও কয়েকজনের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। রিমকি বলল, 'জানালায় চলো, শিগগির!'

জানালা দিয়ে বেরিয়ে শূন্যে পা রাখল রিমকি। ভাসতে লাগল। কিন্তু আমি কি করব? লাফিয়ে পড়লে তো আস্ত থাকব না। খপ্ করে আমার হাত ধরে টান দিল সে। আমাকে বের করে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল। নিচে রাস্তায় লোক জমে গেল এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখে। এক বৃদ্ধা চিৎকার করতে করতে পাগলের মত ছুটল রাস্তার মাঝখান দিয়ে।

কয়েকটা উঁচু উঁচু দালানের ওপর দিয়ে ভেসে আমরা গিয়ে নামলাম এক নির্জন গলিতে। নিজ বাড়ির দরজায় দাঁড়ানো এক বৃদ্ধ ওই দৃশ্য দেখে সংজ্ঞা হারাল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে রিমকি বলল সে ক'টা আণ্ডারওয়্যার কিনবে।

আমি বললাম ওসবের সময় নেই। পুলিশরা দেখলে...

একটা ট্যাক্সি দেখে হাত তুললাম। আমরা উঠতে যাচ্ছি, দেখি যে হিটলার আসছে ছুটে। সেও উঠে পড়ল আমাদের সঙ্গে। ট্যাক্সি চলতে লাগল।

সতেরো

রিমকি হিটলারের মাথায় হাত বুলাচ্ছে। হিটলার আরামে তার কোলে মুখ গুঁজে রয়েছে।

'তোমাকে এখন একটা নিরাপদ জায়গায় রেখে আমি কিমরিকে ধরব,' বললাম রিমকিকে।

'কিমরি?'

'আরে, তোমার অপুর অংশটা। সে ওটাই বলে নিজের নাম। তাকে পুলিশের হাতে দিতে পারলেই তোমার বিপদ কেটে যাবে।'

আমার নির্দেশে ড্রাইভার ট্যাক্সি রাখল একটি টেলিফোন বুথের সামনে। দি সিটাডেল অফিসে ফোন করলাম প্যাটেল সাহেবের সেক্রেটারি কৃষ্ণা চৌহানকে। কৃষ্ণা সব সময় আমার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। তার বাসার ঠিকানাটা নিয়ে বললাম আমি বা আর কেউ যাবে তার কাছে। সে বলল তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরবে।

টেলিফোন করে ফিরে এসে দেখি রিমকি নেই। হিটলার শুয়ে আছে গাড়ির ফ্লোরে। ভয় পেয়ে গেলাম। হিটলার বলল রিমকি তার নিষেধ না শুনে চলে গেছে রাস্তার ওপাশের বড় পোশাকের দোকানটায়। একটা পুলিশ তাকে দেখে ফেলেছে। অন্য পুলিশদের খবর দিতে পাঁচ মিনিটও

লাগেনি। ওরা ঘিরে ফেলেছে দোকানটা।

'দেখি ওখানে কি ঘটছে। তুমি থাকো এখানে।'

প্রবেশে বাধা দিল না পুলিশরা। ভিতরে পা দিতেই দারোগা রামচাঁদের দেখা পেলাম।

হেসে বললাম, 'কি ব্যাপার? ভাবীর জন্য কেনাকাটা হচ্ছে নাকি?'

'বাজে কথা রাখো। সে কোথায়?'

বিরাট দোকান। কার্পেট, দামী আসবাব, এয়ারকণ্ডিশন, সারি সারি লাইফ-সাইজ মডেল দাঁড়িয়ে আছে নানা ধরনের ও স্টাইলের পোশাক পরে। এক কোণে কয়েকটি মেয়েকে দাঁড় করিয়ে পাহারা দিচ্ছে এক কনস্টেবল। দোকানের ম্যানেজার-কর্মচারীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে উদ্বিগ্নমুখে। কিন্তু রিমকিকে দেখলাম না।

দারোগার প্রশ্নের জবাবে বললাম, 'কার কথা বলছ?'

'রিমকি সামন্ত। ন্যাকামি কোরো না সাগর, এটা খুনের কেস।'

'জানি। কিন্তু আমার তাতে কি। আমি তো এই মাত্র এসেছি।'

এতে একটু দমল সে। পুলিশদের হাঁক দিয়ে বলল তন্ন তন্ন করে দেখতে, সবকিছু ওলট-পালট করে খুঁজে দেখতে। মেয়েটি কোথাও আছে। 'দরকার হলে মহিলাদের ড্রেসিং রুমে দেখো।'

মিনিট কয়েকেব মধ্যে ছয়-সাতজন ক্রুদ্ধ মহিলা গায়ে চাদর জড়িয়ে দারোগা রামচাঁদের সামনে এসে রুখে দাঁড়াল। রিমকি নেই ওদের মধ্যে। আমি সরে গেলাম মোমের মডেলগুলোর দিকে। সন্দেহ হলো, ওদের মধ্যেই রিমকি থাকতে পারে। সন্দেহ ঠিক প্রমাণিত হলো। অবিকল মোমের পুতুলের ভঙ্গিতে সে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ঘোমটার মত করে ওড়না জড়ানো, পরনে নীল শাড়ি। খুব কাছে না গেলে

বোঝার উপায় নেই যে মোমের মডেল নয়।

'চলে যাও, তাকিয়ো না আমার দিকে,' বলল সে ফিসফিস করে।

'তোমাকে ভালবাসি যে। না তাকিয়ে পারছি না। তুমি ভয় পেয়েছ?'

'ভীষণ। চলে যাও।'

লক্ষ করলাম রিমকি শূন্যে উঠে গেছে কয়েক ইঞ্চি। আঁতকে উঠে খপ করে ওর কাঁধে হাত দিয়ে নামিয়ে দিলাম।

'মডেলটার গায়ে হাত দিচ্ছ কেন?' মহিলাদের জটলা থেকে ছুটে এসে প্রশ্ন করল রামচাঁদ।

'আমার ভাল লাগে। ডামিই পছন্দ আমার।'

রামচাঁদ তাকাল রিমকির দিকে। বলল, 'ডামিই পছন্দ করো, তাই না? আমার বোঝা উচিত ছিল আগেই,' বলেই সে একটানে রিমকির মাথায় জড়ানো ওড়নাটা খুলে ফেলল। কিন্তু রিমকিকে ধরে ফেলার আগে সাঁ করে উঠে গেল সে রামচাঁদের নাগালের বাইরে। রামচাঁদ 'হায় ভগবান!' বলে লাফ মেরে পিছিয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হলো? আজকাল বাতাসের চেয়ে হালকা মডেল তৈরি হচ্ছে জানো না?'

এ সময় হিটলার এসে ঢুকল দোকানটায়। পুলিশী তল্লাশীর হট্টগোলের মধ্যে তার প্রবেশ কেউ লক্ষ করেনি।

'কি ব্যাপার? এরিমধ্যে একটি জুটিয়ে নিয়েছ?' বলল হিটলার আমার পাশে মিনিট খানেক আগে এসে দাঁড়ানো এক সেলস্-গার্ল-এর দিকে ইঙ্গিত করে।

হিটলারের এই বাণী শুনে 'বাবাগো' বলে মূর্ছিত হয়ে ফ্লোরে ঢলে

পড়ল সেলস-গার্লটি। দারোগা রামচাঁদ মুখখানি ময়দার বস্তার মত করে পিছিয়ে গেল। ঘরসুদ্ধ আর সব লোক নীরব-নিথর হয়ে আঁকড়ে ধরল একে অপরকে।

'কি হে রামচাঁদজী! এবার দেখলে তো সবাক কুকুর আর ভাসমান নারী?' বললাম দারোগাকে।

'আমি সব বিশ্বাস করি···চলো···ওসি সাহেবের কাছে···আমি আর এ দৃশ্য দেখতে পারছি না।'

হিটলার মূর্ছিত সেলস-গার্ল-এর মুখের কাছে মুখ নামিয়ে দেখল। 'কি মজার ব্যাপার। এই মেয়েগুলো কেমন কথায় কথায় ভিরমি খায়,' বলে চাটতে লাগল মুখটা।

'চাটবে না ওকে। ওর মেক-আপ পেটে গেলে বিষক্রিয়া হতে পারে।' বললাম তাকে।

'হলে হোক, খুব স্বাদ পাচ্ছি চেটে।'

দৈত্য-দানব দেখলে লোকের যে অবস্থা হতে পারে দারোগারও তাই হলো। আমাকে বলল, 'ওটাকে থামাও না একটু।'

'রিমকি আমার পাশ দিয়ে ভেসে যাবার সময় বলল, 'পালিয়ে যাব?'

'না। আমাদেরকে এখন ওসি অর্জুন মেহরার কাছে যেতে হবে।'

রিমকি নেমে এল আমার নাগালের মধ্যে। লম্বা হয়ে শোয়া অবস্থায়।

রামচাঁদ সামলে ওঠার চেষ্টা করে আমাকে অনুরোধ করল, 'মেয়েটাকে সোজা হয়ে দাঁড়াতে বলো না কেন?'

আমি রিমকিকে বললাম, 'যেমন আছ তেমনি থাকো। এ ভাবেই তোমাকে লোকে দেখুক। তাহলে সাক্ষী বাড়বে।'

তার কাঁধ ধরে ঠেলতে লাগলাম দরজার দিকে। দৃশ্যটা চমৎকারই হলো বটে। রিমকি শুয়ে আছে বাতাসে ভর করে। চাকাহীন প্যারাম-বুলেটারের মত আমি তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি।

হিটলার বলল, 'দোস্ত, রাস্তায়ও এভাবেই যাবে নাকি?'

'ইচ্ছা তো সেরকমই,' বললাম তাকে।

'অ্যাই সাগরবাবু! ওটাকে নামাও,' বলে রামচাঁদ পুলিশদের হুকুম দিল আমাদের দু'জনকে ওয়াগনে তুলে নিতে। পুলিশরা প্রথমে দ্বিধা করল, পরে অনিচ্ছায় এগিয়ে এল।

রিমকিকে বললাম, 'ব্যাটারা ঝামেলা বাধাবে দেখছি।'

রিমকি বলল, 'সামলাচ্ছি ওদেরকে।' একটি আঙুল তুলল সে পুলিশ-দের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে ওদের ওপর পড়ল বৃষ্টির ফোঁটা।

'বৃষ্টি! বৃষ্টি!' চেঁচিয়ে উঠল পুলিশরা।

'বৃষ্টি! ঘরের ভিতর কিসের বৃষ্টি!' খেঁকিয়ে উঠল রামচাঁদ।

সঙ্গে সঙ্গে রিমকি আঙুলটা তার দিকে ঘোরাল।

'হায় ভগবান! এ যে সত্যি বৃষ্টি হচ্ছে!' বলে জমে গেল দারোগা।

দেখলাম ওরা যতই সরে যেতে চায় বৃষ্টিও সরে যায় ওদের সঙ্গে।

আঙুল নামাল রিমকি। বৃষ্টিও থামল। রামচাঁদ বলল, ওয়াগনে তোলার কথা সে আর বলবে না। আমাদের ইচ্ছাই মেনে নেবে। খুশি হয়ে রিমকি আবার শূন্যে শায়িত অবস্থায় চলে গেল। আমি তাকে ঠেলে নিয়ে থানায় যাবার উদ্দেশে দরজা খুলতেই সুবল এসে প্রবেশ করল দোকানে। দেখেই বোঝা গেল, মদমত্ত অবস্থায়।

'কোথায় পালাবে আমার বন্ধু ডাক্তারকে খুন করে? এইবার পেয়েছি তোমাকে,' বলল সুবল।

আমরা সবাই হকচকিয়ে গেলাম। কেউ নড়লাম না। রিমকি পা দুটো নামিয়ে দাঁড়াল সুবলের সামনে। বলল, 'খুন আমি করিনি, সুবল।'

'তুমিই করেছ। নাও, এই তার সাজা!'

'সরে যাও!' চিৎকার দিয়ে হিটলার লাফ দিল সামনে। কিন্তু তার দেরি হয়ে গেছে। সুবলের গুলি লেগে গেছে রিমকির গায়ে। টলতে টলতে রিমকি পড়ে গেছে ফ্লোরের ওপর।

তাকিয়ে দেখা ছাড়া কেউ কিছু করতে পারল না। ছুটে গেলাম রিমকির পাশে। শুনলাম হাতের পিস্তল ছুঁড়ে ফেলে সুবল কাঁদছে, 'ভগবানের দোহাই, আমি এটা করতে চাইনি...'

আঠারো

হাসপাতালে আধঘণ্টা প্রতীক্ষা করে আছি ডাক্তার কি খবর দেন তা শোনার জন্য।

দারোগা রামচাঁদ, ওসি অর্জুন মেহরা, হিটলার, সুবল আর আমি ছাড়া রয়েছে সুবলের পাহারায় কয়েকজন পুলিশ। অর্জুন আর রামচাঁদ বিস্ময়ের দৃষ্টিতে বার বার তাকাচ্ছে হিটলারের দিকে। অর্জুন ঘটনার পূর্ণ বিবরণ পেয়েছেন এবং হিটলারকে আমার সঙ্গে কথা বলতে শোনার পরে আমার কথায় আগে বিশ্বাস করেননি বলে দুঃখ প্রকাশ করলেন।

'আপনার হাত এখন মুক্ত! কিন্তু এ কেস কিভাবে আমরা আদালতে পেশ করব? মেয়েটা বাঁচলে হয়। এমন বিশ্রী ঘটনায় আগে কখনও পড়িনি। আমার যে সন্দেহ হয়েছিল আপনাকে এতে কিছু মনে করবেন না, মি. সোম। অন্য মেয়েটার খোঁজে যেতে চাইলে যান। আমার আপত্তি নেই।'

কিন্তু কিমরির পিছু নেয়ার মনোবল আমার নেই। রিমকির প্রাণ নিয়ে চলছে টানাটানি। মাটি সরে গেছে আমার পায়ের নিচে থেকে। আমি কাছাকাছি থাকতে চাই। তার কাছে কাউকে যেতে দেয়া হলে আমিই যেন হই সে ব্যক্তি।

হিটলারের মনোভাবও আমারই মত।

আমরা বসে রইলাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম।

ডাক্তার বের হলেন। প্রশ্ন করলেন, 'আপনাদের মধ্যে সাগর সোম কে?'

অর্জুন মেহরা গিয়ে কিছু বললেন ডাক্তারকে। ডাক্তার কাঁধ ঝাঁকালেন। ভঙ্গিটা দেখে দমে গেল মনটা। অর্জুন আমাকে দেখিয়ে দিলেন। ইশারা করলেন ডাক্তার।

পা দুটো লোহার মত ভারী লাগছে। টেনে টেনে এগিয়ে গেলাম। হিটলার আমার পিছনে।

'কেমন আছে সে, ডাক্তার?' প্রশ্ন করলাম।

'তেমন ভাল নয়। আপনাকে চাচ্ছে। তাকে উত্তেজিত করবেন না। আমার মনে হয় না টিকে উঠতে পারবে।'

'পারতেই হবে। তাকে রক্ষা করুন, ডাক্তার।'

'আমরা সাধ্যমত করছি, কিন্তু সে চেষ্টা করছে না। রোগী নিজেই হাল ছেড়ে দিলে ডাক্তার কি করবে? তার যেন বেঁচে থাকার ইচ্ছাই নেই।'

'আমি যেতে পারি ওর কাছে?'

'এক মিনিটের জন্য। কি বলছেন সে ব্যাপারে সাবধান থাকবেন।'

হিটলারসহ ঢুকে পড়লাম কেবিনে। ছোট্ট পুতুলের মত সে শুয়ে আছে। বিছানার পাশে বসে হাতটা তুলে নিলাম।

চোখ খুলে সে বলল, 'ভয় পাচ্ছিলাম, তুমি আসবে না।'

হিটলার মুখটা তুলে দিল বিছানায়। মুহূর্তখানেক তার মাথায় হাত বুলিয়ে আবার তাকাল আমার দিকে।

'সুস্থ হয়ে যাও রিমকি, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।'

'হব। তবে আমি ক্লান্ত। ঘুমালে ভাল হয়ে যাব।'

'ডাক্তার বলছেন তুমি চেষ্টা করছ না। তোমাকে লড়তে হবে। হিটলার আর আমি তোমাকে চাই। আমাদেরকে ফেলে যেতে তুমি পারো না।'

'সেটা যে বড় কঠিন। আমার অর্ধেক প্রতিরোধ ক্ষমতা যে নেই। আমার বাকি অর্ধেকটা এখানে থাকলে এধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারতাম।'

তখনি ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকল। কিমরির সাহায্য দরকার। কিমরির সাহায্য ছাড়া রিমকি একা লড়ে পেরে উঠবে না।

নার্স এসে বলল বিদায় নিতে। 'আবার আসব। কথা দাও আমার জন্য অপেক্ষা করবে?'

'শিগগির এসো,' বলল সে।

হাসপাতাল থেকে বিদায় নেয়ার সময় সুবল কান্নাজড়ানো স্বরে বলল, 'আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই এ কাজ করেছি।'

'জানি। তুমি ডাক্তারের মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলে মনে।'

রাস্তায় নেমে হিটলারকে বললাম, 'আমরা কিমরির খোঁজে যাচ্ছি। একমাত্র সে বাঁচাতে পারে রিমকিকে।'

'কেমন করে?'

'বুঝতে পারছ না? রিমকির অর্ধেক মনের জোর আর দৈহিক শক্তি তার কাছে। দু'জনকে একত্রে মিলিয়ে দিলে ওরা বাঁচার লড়াইটা জোরসে চালাতে পারবে। হংস ভরদ্বাজ কিমরির সন্ধান জানে। তার সঙ্গেই প্রথম দেখা করব।'

সেটা খুব বড় রকমের ঝুঁকি নেয়ার মত হবে না?'

'ঝুঁকিটা নিতেই হবে। সে যদি খবর দিতে না পারে তাহলে ডুবে যাব।'

'ওই ছবিগুলো না পেলে হংস মুখ খুলবে না,' বলল হিটলার। 'ওগুলো হাতিয়ে নিয়ে হংস-র সাথে বিনিময় বা লেনদেন করো না কেন?'

'দারুণ আইডিয়া, হিটলার,' বলে ট্যাক্সি ডাকলাম। এখন ৭টা ৫৫। প্যাটেল সাহেব এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছেন। 'প্যাটেলজীর অফিসে ঢুকতে পারলে লোহার সেফটা খোলা যাবে।'

যেতে যেতে হিটলার বলল, 'আমি এতে জড়িত হতে চাই না। পরামর্শ দিলাম মাত্র।'

'তোমার ভাল লাগবে আমার সঙ্গে থাকতে। কারও চোখে না পড়ে প্যাটেলের অফিসে ঢোকার ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু। ঢুকতে পারলে আর সমস্যা হবে না,' আশ্বস্ত করলাম তাকে।

'ধরা পড়লে একটা কুকুরকে ওরা জেলে পুরবে না, কি বলো?'

'না, তারা তোমাকে কোথাও নিয়ে গুলি করবে।'

'সেই আশঙ্কাই করছিলাম,' বলল হিটলার বিষণ্ণ কণ্ঠে।

'অত চিন্তা করছ কেন, একবারের বেশি তো গুলি করবে না,' বললাম তাকে চাঙ্গা করার উদ্দেশে।

প্যাটেলের অফিস দি সিটাডেল ভবনের সর্বোচ্চ তলায়। রাস্তার কোণায় ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে প্রবেশদ্বার পর্যন্ত সামান্য দূরত্ব হেঁটেই অতিক্রম করলাম। রাতের দরওয়ান তখনও আসেনি। অনুসন্ধান ডেস্কে বসে আছে একটি লোক। আমার অচেনা। তার সামনে দিয়ে লিফটে

উঠতে হবে। তাকে গিয়ে বললাম, 'নাইট এডিটরের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তিনি আমার বন্ধু। যেতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। যান।'

স্বয়ংক্রিয় লিফটে উঠলাম। লিফট চলল ওপরে। আটতলায় গিয়ে নামলাম। চললাম প্যাটেলের অফিসের দিকে। হিটলার কান খাড়া করে মাথা একদিকে হেলিয়ে অনুসরণ করল আমাকে।

'থামো,' বলল হিটলার।

'কি হয়েছে?'

'কেউ যেন আছে ওখানে। আমি শুনতে পাচ্ছি।'

'ধ্যাৎতেরি। এখন কি করব?'

'কোথাও আড়াল নিয়ে অপেক্ষা করব,' বলল হিটলার।

দরজার নবটা ঘোরালাম আস্তে করে। ইঞ্চিকয়েক ফাঁক হলো দরজাটা। অফিসের বাইরের কক্ষ খালি। কিন্তু প্যাটেলের ভিতরের অফিস কক্ষের দরজা খোলা। সেখান থেকে গলার আওয়াজ আসছে।

'হিটলার, তুমি এখানে থাকো,' ফিসফিস করে বলে প্রবেশ করলাম বাইরের অফিস কক্ষে। ভিতরের রুমের খোলা দরজায় উঁকি দিতেই গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল।

প্যাটেলের লোহার সেফটির কাছে হংস ভরদ্বাজ দাঁড়ানো। সঙ্গে তার তিন গুণ্ডা। মুখে সিগারেট, পকেটে হাত গুঁজে হংস দেখছে এক গুণ্ডাকে। গুণ্ডাটি সেফ খোলার চেষ্টায় ব্যস্ত।

পিছিয়ে আমি চললাম হিটলারের সাথে মিলিত হবার জন্য। হঠাৎ থেমে গেলাম। বাইরের কক্ষে এক টেবিলের ওপর ফ্ল্যাশগানসহ একটি প্রেস ক্যামেরা! ওটা তুলে নিয়ে বাইরে এলাম।

'ঘটনা কি?' প্রশ্ন করল হিটলার।

'হংস আর গুণ্ডারা সেফ খুলছে। এখন শোনো, আমি ফিরে যাচ্ছি ওদের ছবি তোলার জন্য। এটা করতে পারলে হংসকে আমরা হাতের মুঠায় পাব।'

'ছবি তুলে বেরিয়ে আসতে তোমাকে ওরা দেবে?

'ওই সময় তুমি উদয় হবে।'

'ওরা একবার আমার মাথার মগজ বের করে ফেলার চেষ্টা করেছে। না, আমি নিরপেক্ষ থাকব।'

'ঘাবড়ে যেয়ো না হিটলার। ছবিটা তুলেই প্লেটটা তোমাকে দেব। তুমি সরে পড়বে। তুমি চলে যাওয়া পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখব ওদেরকে। ছবিটা যতক্ষণ আমাদের হাতে থাকবে ততক্ষণ ওরা আমার কোন ক্ষতি করবে না।'

'সেটা তোমার ধারণা। ওদের ধারণা ভিন্ন রকম হতে পারে।'

ভাবলাম, হয়তো তাই। তবু সুযোগটা নিতে হবে।

'রাস্তায় নেমে তুমি সোজা চলে যাবে মিস্ কৃষ্ণা চৌহানের বাসায়। বাসাটা বুঝি চেনো। ওখানে অপেক্ষা করবে আমার জন্য। তোমার কথা বলেছি তাঁকে। এক ঘণ্টার মধ্যে আমি না ফিরলে থানায় গিয়ে ওসি অর্জুন মেহরাকে ছবিটা দেবে।'

উদ্বিগ্নভাবে হিটলার লিফ্‌টে প্রবেশ করে দাঁড়াল। ক্যামেরার শাটার এডজাস্ট করে লেন্স-স্টপ সেট করে আমি ফিরে গেলাম অফিসের বহির্কক্ষে। দরজার কাছে গিয়ে শুনলাম হংস ভরদ্বাজ গাল দিচ্ছে তার গুণ্ডাটাকে, 'খুলতে না পারলে বলছ না কেন যে পারছ না? বিশ মিনিট পার করে দিয়েছ।'

ক্যামেরাটা দরজার মুখে বাগিয়ে ধরে চেঁচিয়ে বললাম, 'যেমন আছ তেমনি থাকো!'

ওদেরকে সময় দিলাম আমার দিকে ফিরে তাকাবার। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় চোখ ঝলসে গেল ওদের। পর মুহূর্তে ছুটে বেরুলাম বহির্কক্ষ থেকে। দরজা বন্ধ করে ঝাঁকি দিয়ে প্লেটটা বের করলাম ক্যামেরা থেকে। হিটলারের মুখে ওটা গুঁজে দিয়ে লিফটের বোতাম টিপে দিলাম। দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা। হংস আর প্রধান গুণ্ডাটি এল ছুটে। গুণ্ডার হাতে পিস্তল। আমি ক্যামেরাসহ হাত দু'টি মাথার ওপর তুলে ফেললাম।

হংস ছিনিয়ে নিল ক্যামেরা। খালি দেখে ছুঁড়ে ফেলল ফ্লোরে। 'প্লেট কোথায়?' প্রশ্ন করল সে।

'নিচে চলে যাচ্ছে। উত্তেজিত হয়ো না। আমার কথা না শুনলে ওই ছবি তোমাকে ভোগাবে,' বললাম তাকে।

'কার কাছে দিয়েছ?'

'কার কাছে দিয়েছি সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে ঘণ্টা-খানেকের মধ্যে ওটা কার হাতে যাবে।'

'আমার সঙ্গে এ চালাকি করাটা তোমার পাগলামি,' বলল হংস চিবিয়ে চিবিয়ে।

'ঠিক আছে, আমি না হয় পাগলই হয়েছি। কিন্তু তোমাকে ফাঁসিয়েছি। সহজে তুমি এর থেকে মুক্তি পাবে না।'

'খুলিটা উড়িয়ে দেব নাকি?' বলল গুণ্ডাটি।

হংস অফিসের দিকে হাত তুলে বলল, 'ভিতরে এসো। কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।'

প্রবেশ করলাম। পিছনে পিস্তল হাতে তার গুণ্ডাটি।

'মতলবটা কি খুলে বলো।'

'দেখো হংস, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি যদি একটা ঠিকানায় না পৌঁছি, তাহলে ছবিটা চলে যাবে ওসির হাতে।'

'কোন্ ঠিকানায়?'

'ছেলেমী কোরো না, হংস। কাজের কথা বলছি, শোন। কিমরিকে তুলে দাও আমার হাতে, আমি তোমাকে ছবিটা দিয়ে দেব।'

কথা বলতে বলতে প্যাটেলজীর টেবিলের ওপর চোখ বুলিয়ে নিলাম। মনে পড়ল টেবিলটার কোথায়ও লুকানো একটা বোতাম আছে। ওটা টিপলেই গোটা বিল্ডিং-এ ঘণ্টা বেজে ওঠে।

হংস হুকুম দিল গুণ্ডাটিকে, 'খুলে ফেলো সেফটা। তার পরে এ ব্যাটাকে শায়েস্তা করব।'

আমি এটা পছন্দ করলাম না। বোতামটা খুঁজে নিয়ে টিপ দিলাম।

তিন গুণ্ডার আরেকজন রামঘুষি মারল আমার কানের ওপর। পড়ে গেলাম ফ্লোরে। কিন্তু তখন ঘণ্টা বাজা শুরু হয়ে গেছে। আমি উঠে দাঁড়াতেই আরেকজন এল ঘুষি বাগিয়ে। কিন্তু হংস বাধা দিয়ে বলল, 'ওকে ধরে নিয়ে চলো, বেরিয়ে যাই এখান থেকে।'

প্যাটেলের একটা ব্যক্তিগত লিফট আছে। ওটাতে উঠে আমাকে নিয়ে নেমে গেল ওরা। নিচে একটা বড় গাড়ি অপেক্ষা করছিল। সবাইকে নিয়ে ওটা ছুটল হংস ভরদ্বাজের বাড়ির দিকে।

হংসের বসার ঘরে ধাক্কা মেরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো আমাকে।

'মীরা ভাটকে ডাকো,' হুকুম দিল হংস।

'বেশি সময় নষ্ট কোরো না। কিমরিকে আমার হাতে তুলে দেয়ার

আর মাত্র পঁয়ত্রিশ মিনিট সময় আছে তোমার,' বললাম তাকে। 'কিমরিকে দাও, নইলে ছবি চলে যাবে মেহ্‌রার হাতে।'

'আমি পরোয়া করি না। তুমি আমার সঙ্গে বেঈমানী করেছ। আগে তোমাকে শিক্ষা দেব,' বলল হংস।

দরজা খুলে প্রবেশ করল মীরা ভাট।

'একে কথা বলাও,' বলল হংস। 'তুমি হয়তো পারবে একে নরম করতে।'

মীরা হেসে বলল, 'তা বোধ হয় পারব।'

ওরা আমার হাত দু'টি বেঁধে ফেলল পিছমোড়া করে। তারপর চেয়ারে বসিয়ে বুক থেকে পা পর্যন্ত বেঁধে দিল চেয়ারের সাথে।

'তাড়াতাড়ি করো, সময় বেশি নেই আমাদের হাতে,' বলল হংস ঘড়ি দেখে।

'বেশি দেরি হবে না। মুখের নকশাটা একটু কেটে বদলে দেব যাতে কোন মেয়ে আর কখনও এর দিকে না তাকায়,' বলে একটা তীক্ষ্ণধার ছুরি বের করল মীরা তার হ্যাণ্ড-ব্যাগ থেকে।

শিউরে উঠলাম। ছুরির ফলা মুখ স্পর্শ করার আগে বললাম, 'ঠিক আছে, কথা বলব।'

'প্লেটটা কোথায়?'

কৃষ্ণা চৌহানের ঠিকানাটা দিলাম।

'চলো, আমরা যাই। দশ মিনিট সময় এখনও আছে,' বলে হংস বেরিয়ে গেল তার গুণ্ডাদের নিয়ে। যাবার আগে মীরাকে বলল, 'তোমার কাজ হয়ে গেলে জাম্বুকে বলবে একে নদীতে ফেলে দিতে।'

'তাই করব,' বলল মীরা ভাট। চোখে তার সাপের দৃষ্টি। হাতে ছুরি।

'স্থির হয়ে বসে থাকো। কয়েকটি আঁচড় দেব। বেশি নয়। প্রথমে তেমন লাগবে না, পরে...' বলে আমার চুল খামচে ধরে মুখটা ওপরে তোলার চেষ্টা করল। আমি মাথা নিচু রাখার চেষ্টা করলাম। রেগে গিয়ে মীরা চেয়ারসহ আমাকে ফেলে দিল চিৎ করে। আমার মুখের ইঞ্চি কয়েক ওপরে নেমে এল তার ছুরি।

ঠিক সেই মুহূর্তে হড়াৎ করে খুলে গেল দরজা। কিমরি এসে দাঁড়াল রুমের মধ্যে। পারলে ছুটে গিয়ে বুকে চেপে ধরতাম তাকে।

মীরা আমার চুল ছেড়ে দিয়ে ওঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি এখানে কেন, চলে যাও।'

'তুমি করছটা কি? কি হচ্ছে সাগর?' জিজ্ঞেস করল কিমরি।

'মীরা আমার মুখটা নাকি মেরামত করবে তাদের পুরানো পারিবারিক কায়দায়,' বললাম চিঁ চিঁ আওয়াজে।

'তাই নাকি? আমি দু'পায়ে খাড়া থাকতে পারবে না,' বলল কিমরি।

'বেরিয়ে যাও! ওপরে গিয়ে অপেক্ষা কর ভরদ্বাজজীর জন্য। আমি তাঁর হুকুমে একাজ করছি,' চেঁচিয়ে বলল মীরা।

'ও আমার। আমি ছাড়া কেউ ছুঁতে পারবে না ওকে,' বলতে বলতে কিমরি এগিয়ে গেল মীরার দিকে। ছুরি উঁচিয়ে মীরা আঘাত করতে উদ্যত হলো কিমরিকে।

'হুঁশিয়ার' বলে চিৎকার দিলাম। কিন্তু তার দরকার ছিল না। কিমরি জানে আত্মরক্ষা করতে। সে অদৃশ্য হয়ে গেল সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে!

মীরা থমকে চিৎকার দিল আতঙ্কে। তার দুই চোখে খ্যাপা দৃষ্টি। হাতে ছুরি বাগিয়ে দেখছে রুমের চারদিকে।

তার ঠিক পেছনে একটা বড় ফুলের পাত্র হঠাৎ টেবিল থেকে লাফিয়ে শূন্যে উঠে গেল। বাতাসে ভেসে এসে পড়ল মীরার মাথায়। মীরা লম্বা হয়ে পড়ে গেল ফ্লোরে। ফুলের পাত্রটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কতগুলো অদৃশ্য হাত ছিটিয়ে পড়া ফুলগুলোকে কুড়িয়ে গোছা করে রেখে দিল চিত হয়ে পড়ে থাকা মীরার বুকের ওপর।

হঠাৎ আবার দৃশ্যমান হলো কিমরি। 'কেমন হলো খেলাটা? ভাল লাগেনি তোমার?'

'খুব ভাল লেগেছে। এখন লক্ষ্মীটি, আমার বাঁধন খুলে দাও।'

'উঁহু, তার আগে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কিন্তু সময় যে নেই। হংস এসে পড়বে।'

'পরোয়া করি না। মীরাকে যা করেছি তাকেও করতে পারি।'

'কিমরি, আমাকে মুক্ত করে দাও। আমি তোমার কাছে একটা উপকার চাই।'

'জানি। কিন্তু আমার কথা আগে শুনতে হবে,' বলে বসল আমার কোলে। গলা পেঁচিয়ে ধরল এক হাতে। 'আমাকে বিয়ে করতে হবে,' বলল সে।

'পাগল হয়েছ নাকি? ওসব কথা বলার সময় এটা?'

'পাগল হইনি। বিয়ে করবে কিনা বলো।'

'বিয়ে রিমকিকে করব। সে ভীষণ অসুস্থ। তোমাকে তার দরকার। তোমার সাহায্য দরকার।'

'আমি সব জানি। এই মাত্র দেখে এসেছি তাকে। রিমকি জানত এখানে কি হচ্ছে। সে-ই আমাকে পাঠিয়েছে তোমাকে উদ্ধারের জন্য। সে তোমার ওপর দাবি ছেড়ে দেবে এই শর্তে রাজি হয়েছি। দাবি সে

ছেড়ে দিয়েছে। তাকে আমার সাহায্যে বাঁচাতে চাইলে কথা দাও যে আমাকে বিয়ে করবে।'

'এসব তোমার নোংরা চালাকি। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। আমি কথা দেব না।'

'কথা না দিলে হংসের হাতে ছেড়ে দেব তোমাকে। রিমকিকে ছেড়ে দেব তার ভাগ্যের হাতে।'

'এভাবে কথা আদায় করে, বিয়ে করে আমাকে ধরে রাখতে পারবে?'

'আচ্ছা সাগর, তুমি কি একটুও পছন্দ করো না আমাকে?'

'পছন্দ ঠিকই করি। রিমকির যা যা আছে সবই আছে তোমারও। কেবল তার ভাল স্বভাবটা ছাড়া।'

'আমি তোমার জন্য ভাল হতে পারি। তুমি আমাকে ভালবাসবে তো?'

হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মগজে। বললাম, 'তুমি রিমকির মধ্যে ফিরে যাও। এ দেহটা ছেড়ে দাও। তোমাদের দু'জনকে আমি বিয়ে করব।'

আমার কোল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। বলল, 'না, আমার নিজের একটা দেহ থাকুক।'

'দেখো, আমাকে পাবার একমাত্র উপায় রিমকির সঙ্গে ভাগাভাগিতে রাজি হওয়া। নইলে আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ।'

'তুমি বুঝতে পারছ না এই দেহটা আমাকে কি সুবিধা দিচ্ছে। যা ইচ্ছা করতে পারি, যেখানে ইচ্ছা যেতে পারি, যাকে ইচ্ছা ভালবাসতে পারি।'

'কিন্তু এতে লাভ হচ্ছে কি?' প্রশ্ন করলাম। 'তুমি সুখী হয়েছ? তুমি তো তোমার অর্ধেক মাত্র। সব ভাল গুণগুলো রিমকির মধ্যে। রিমকির মধ্যে ফিরে গেলে তুমি হবে পূর্ণাঙ্গ এবং পাবে আমাকেও।'

রুমের মধ্যে পায়চারি থামিয়ে কিমরি তাকাল আমার দিকে। বলল, 'শয়তান কাঁহিকা। আমি তো ওভাবে চিন্তা করে দেখিনি! তোমার কথাই ঠিক। রিমকির জন্য মন কাঁদে। তাকে কতভাবে প্রলুব্ধ করতাম, ভুল কাজ করার জন্য প্ররোচনা দিতাম, লড়াই করতাম। এখন করতে পারি না। ঠিক আছে, সে আমাকে ফিরিয়ে নিতে চাইলে আমি রাজি।'

'কিন্তু বলে দিচ্ছি, ভাল হয়ে চলতে হবে। চুরি, পকেট মারা, ওসব চলবে না।'

'তোমার জন্য আমি সব কিছুই মেনে নিচ্ছি,' বলে সে আমার দড়ির বাঁধনগুলো কেটে দিল মীরা ভাটের ছুরি দিয়ে।

'আমাদেরকে এখনি যেতে হবে রিমকির কাছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে তাকে ছেড়ে আসার পর।'

'উতলা হোয়ো না। সে সুস্থ হয়ে উঠবে।'

হঠাৎ মনে পড়ল হিটলারের কথা। টেলিফোনের কাছে ছুটে যেতে যেতে বললাম, 'কি সব্বোনাশ! এতক্ষণে হংস বোধ হয় বেচারার গলাটা কেটে ফেলছে!'

থানায় লাইন পেলাম। অর্জুন মেহরাকে জানালাম সব ঘটনা। কৃষ্ণার বাসার ঠিকানাটা দিয়ে বললাম, 'এখনি একটা স্কোয়াড পাঠিয়ে দিন। ওই ছবিটা পেলে হংস ভরদ্বাজ আর তার স্যাঙ্গাতদের খাঁচায় পুরতে আপনার অসুবিধা হবে না।'

'পাঠাচ্ছি,' বলে রিসিভার রাখলেন মেহরা।

'চলো এবার, হাসপাতালে যাই,' বলে কিমরিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। 'লক্ষ্মী মেয়ে। এখন অদৃশ্য হয়ে যাও। পুলিশরা যেন না দেখে তোমাকে।'

পলকে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

হাসপাতালে দারোগা রামচাঁদ বলল, 'মেয়েটির অবস্থা খারাপ। ডাক্তাররা দেখছেন।'

'যেতে পারব?'

'ডাক্তাররা বের হবার আগে নয়।'

কিমরি আমার কানের কাছে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'টোম্যাটোর মত গালওয়ালা এ ব্যাটা কে?'

বললাম, 'দারোগা।'

'কাতুকুতু দেব ওকে?' জিজ্ঞেস করল সে।

বললাম, 'দুষ্টুমি কোরো না এখন।'

'কেন, মজাই তো হবে।'

'দেখো, ওসবের সময় এখন নয়।'

রামচাঁদ দু'চোখ গোল করে বলল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ?'

'নিজের সাথে। এতে তোমার কি?'

'তোমার মগজটা বোধ হয় তরল হয়ে যাচ্ছে,' মন্তব্য করল সে।

'মগজ না থাকার চেয়ে সেটা ভাল,' ধ্বনিত হলো কিমরির কণ্ঠস্বর।

'ওটা কি হলো?' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে প্রশ্ন করল রামচাঁদ।

'কোথায় কি? আমি তো কিছু বলিনি!'

'সাগরবাবু, ওই নকল আওয়াজে আরেকবার কথা বললে তোমাকে আমি হাজতে নিয়ে যাব।'

ঠিক এসময় এক তরুণী সুন্দরী নার্স আসল করিডোর দিয়ে। ওকে

দেখে রাগটা গিলে ফেলে রামচাঁদ বলল, 'নমস্তে!'

নার্সটা থেমে হাসি ছড়িয়ে বলল, 'নমস্তে। কিছু করতে পারি আপনার জন্য?'

রামচাঁদ জবাব দেয়ার আগেই তার পিছন থেকে শোনা গেল কিমরির গলা, 'তোমার ওই নীরস মুখ থেকে হাসিটা মুছে ফেলতে পারো।'

'আপনি বললেন এ কথা? আপনার মুখটা চাঁদের মত? আর গলার স্বরটা তো বেড়ালীর মত,' বলে ক্রুদ্ধভাবে পা ফেলে এগিয়ে গেল নার্সটা রামচাঁদের সামনে দিয়ে।

হঠাৎ একটা চড়ের শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে নার্সের লাফ এবং চিৎকার।

'আপনি কি ভদ্রলোক?' ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল নার্সটি।

চোখ কপালে তুলে রামচাঁদ বলল, 'আমি তো কিছুই করিনি!'

কটমট দৃষ্টিতে তাকে বিদ্ধ করে নার্সটি চলে গেল।

রিমকির কেবিনের দরজা খুলে গেল। ডাক্তার বের হলেন।

লাফিয়ে উঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'যেতে পারি?'

'দুঃখিত। আমি যা করার সবই করেছি। কিন্তু সে লড়বে না...তার যেন বেঁচে থাকার ইচ্ছাই নেই।'

তাঁর পাশ দিয়ে প্রবেশ করলাম কেবিনে। একজন নার্স চাদরে ঢেকে দিল রিমকির মুখটা। চলে গেল বাইরে।

'কেটে পড়ল নাকি?' বলে চাদরটা একটানে সরিয়ে আমার পাশে দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়াল কিমরি।

'এ একটা আস্ত বুদ্ধু,' বলল কিমরি।

'ওসব বোলো না। রিমকি বাঁচতে চেয়েছিল, কিন্তু আমরা আসতে

দেরি করে ফেলেছি,' বললাম তাকে।

'আরে ধুর! ও মরার ভান করছে। রিমকি, চালাকি ছাড়। নইলে তোর দেহটা নিয়ে পালাব। তুই বিদেহী হয়ে থাকবি।'

'পালা না, আমি ভূত হয়ে তোর পিছু নেব,' রিমকির গলা শোনা গেল কাছাকাছি।

চমকে উঠে তাকালাম চারদিকে। দেখলাম বিছানার পাশে একটা ঝাপসা ছায়ামূর্তি।

'আর দৃশ্যমান হবি না। তোর গায়ে কাপড় নেই,' বলল কিমরি।

'আহা, আমি যেন জানি না। ছিলি কোথায় তোরা দু'জন? আমি তোদের খুঁজতে যাচ্ছিলাম।'

'এক মিনিট,' বললাম আমি। 'তুমি তাহলে মরোনি আসলে?'

'নিশ্চয় মরেনি। তোমাকে বলেছিলাম না চিন্তা না করতে?' বলল কিমরি।

'সাগর কি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিল?' জানতে চাইল রিমকি।

'পুরুষদের স্বভাব তো জানিস। যাকগে, এখন ঢুকে পড় তোর দেহে। আমাদের দু'জনের অনেক কথা বলার আছে।'

'তোর সঙ্গে থাকতে আমার ভালই লাগবে,' বলেই ছায়ামূর্তি বিছানায় উঠে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এক মুহূর্ত পরে রিমকির লাশটা হঠাৎ উঠে বসল।

'আমি ফিরে আসতে চাই তোর মধ্যে। নইলে সাগর বিয়ে করবে না আমাকে।' বলল কিমরি। রিমকি জবাব দিল, 'কখ্খনো নয়। তুই আমাকে অনেক জ্বালিয়েছিস। মরে গেলেও তোকে নেব না।'

'রিমকি, মাথা ঠাণ্ডা করো। এক ঘণ্টা পরে নতুন চাঁদ উঠবে।

ডাক্তার ঘোষালের কথা যদি সত্য হয় তাহলে ওই সময় তোমরা তোমাদের ভৌতিক বা প্রেত-শক্তি হারাবে। তখন আর কিছুই করার থাকবে না। ওকে ফিরিয়ে নাও। নইলে গোটা জীবন সে নষ্টামী করে সমস্যা সৃষ্টি করবে তোমার জন্য,' বোঝালাম তাকে।

'বুঝলাম। কিন্তু ডাক্তারকে যে সে মারল? একটা খুনীকে জায়গা দেব নিজের দেহের মধ্যে?'

'ডাক্তারকে যদি বাঁচিয়ে তুলি?' বলল কিমরি।

'সেটা কিভাবে সম্ভব?' প্রশ্ন করল রিমকি।

'বুড়োকে খুন করিনি।'

'মিথ্যে বোলো না কিমরি। আমি ডাক্তারকে মরতে দেখেছি,' বললাম তাকে।

'তোমার মনে হয়েছে মরতে দেখেছ,' বলল কিমরি মৃদু হেসে। 'গণ-সম্মোহনের কথা শোনোনি কোনদিন?'

'গণ-সম্মোহন? কি বলছ তুমি?'

'কি বোকা আমার মনের মানুষটা। আমি ডাক্তারকে কোমার মধ্যে রেখে তোমাকে আর সুবলকে সম্মোহিত করেছিলাম। সম্মোহনের দ্বারা তোমাদেরকে বিশ্বাস করিয়েছিলাম যে ডাক্তার মরে গেছে আঘাত পেয়ে। চিঠি আর সালোয়ারটা ছিল সঠিক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য।'

'ডাক্তার তাহলে এখনও বেঁচে আছেন?' বললাম অবিশ্বাসের সুরে।

'কিন্তু তিনি তা জানেন না। এ মুহূর্তে তিনি রয়েছেন কেন্দ্রীয় মর্গে। ভাবছেন মরে গেছেন। কিন্তু সবই আমরা ঠিক করে ফেলতে পারব।'

'তাহলে আমরা দেরি করছি কেন? মাঝরাতের আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি!' চেঁচিয়ে উঠলাম।

'রিমকি, আমাকে ফিরিয়ে নিবি তো?'

'নিতে তো হবে দেখছি। দুষ্টুমি করবি না তো?'

'করবে না, করবে না। করতে চাইলে আমি সামলাব।'

চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল রিমকির। বলল, 'ঠিক আছে, আয়।'

কিমরি ঘনিয়ে এল আমার কাছে। বলল, 'এই দেহে আর কোনদিন দেখবে না আমাকে।'

তাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম। বললাম, 'ভাল হয়ে যাও।'

আমাকে জানালার দিকে ঘুরিয়ে কিমরি নগ্ন হলো।

দশ সেকেণ্ড পরে দারোগা রামচাঁদ এসে বলল, 'মরেই গেল, না? দুঃখিত, দোস্ত।'

বিছানার দিকে এক নজর দেখতে গিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। রিমকি আর কিমরি একই বালিসে মাথা রেখে শুয়ে আছে পাশাপাশি। জানতাম কি ঘটছে, তবু অস্বস্তি বোধ করলাম।

রামচাঁদ দু'জনকে ওই অবস্থায় দেখে হাত দিয়ে চোখ ঢাকল। তারপর আবার দেখল। তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ঘড় ঘড় আওয়াজ বের হলো গলা দিয়ে। ঘাম দেখা দিল তার কপালে। ভগ্ন স্বরে সে বলল, 'কি দেখছি আমি? আমার চোখ খারাপ হয়ে গেল? বিছানায় ওরা একজন, নাকি দু'জন?'

'তুমি বোধ হয় বেশি খাটাখাটি করছ। কোথাও গিয়ে শুয়ে পড়ো।'

'হ্যাঁ, তাই করব,' বলে পা দুটো টানতে টানতে সে বেরিয়ে গেল।

রিমকির দেহে কিমরির মিশে যাওয়া দেখার জন্য বিছানায় দৃষ্টি ফেলে বললাম, 'তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো।'

রিমকি উঠে বসল বিছানায়। মিনিট দু'য়েকের মধ্যে তৈরি হচ্ছি তোমার সঙ্গে যাবার জন্য,' বলল সে।

'ওরা যেন তোমাদের না দেখে।'

করিডোরে বেরিয়ে দেখলাম দু'হাতে মাথা রেখে বসে আছে রামচাঁদ। দু'জন পুলিশ উদ্বেগের সঙ্গে দেখছে ওকে।

অদৃশ্য রিমকির স্বর শুনলাম কানের কাছে, 'চলো।'

মাঝরাতের ১৫ মিনিট আগে পৌঁছলাম মর্গে। মোটা গোঁফ, বাঁকানো নাকওয়ালা একজন বসে আছে ডেস্কের পেছনে। 'কি চাই,' জানতে চাইল লোকটা।

'একটা লাশ দেখতে চাই,' বললাম আমার দি সিটাডেলের কার্ডটা দেখিয়ে। 'লোকটার নাম ডাক্তার ঘোষাল।'

'কাল আসবেন। রাতে দেখা যাবে না।'

রিমকিকে বললাম, 'কিছু একটা করো।'

'করছি,' বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তার পোশাক স্তূপ হয়ে পড়ে রইল ফ্লোরে।

মর্গের দরওয়ানটি উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। নিজের গলায় হাত দিয়ে বলল, 'কো··· কোথায় গেল মেয়েটি?'

'মর্গের ভিতরে। এখনি ফিরে আসবে।'

ঢলে পড়ল লোকটা তার চেয়ারে। আমি তাকে দোষ দিতে পারলাম না।

ডাক্তার ঘোষাল বেরিয়ে এলেন। আমি ছুটে গিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম।

'ভাল করে ধরো। বুড়ো এখনও একটু ঘোরের মধ্যে আছে,' বলল রিমকি পোশাক পরে দৃশ্যমান হয়ে।

মূর্ছিত দরওয়ানটার সামনে দিয়ে তিন জন হেঁটে বেরিয়ে পড়লাম।

উনিশ

শরীফ, এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। তুমি শুনতে চাইলে, তাই শোনালাম। এতক্ষণ যা শুনলে এতে তোমার মনে হতে পারে যে কাহিনীটা বানোয়াট। প্যাটেল সাহেব তো শেষ পর্যন্তও বিশ্বাস করেননি। তবে কথাটা কি জানো, দুনিয়ায় অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। বলতে চাই না যে যা কিছু পড়বে বা শুনবে তাই বিশ্বাস করতে হবে। কিন্তু সব কিছুকে অবিশ্বাস করার অভ্যাসটাও ভাল নয়। তাতে জীবনের অনেক মজাই হারাতে হয়।

ডাক্তার ঘোষালকে ফিরে পেয়ে খুশি হই আমরা। কিমরিহীন রিমকিকে পেয়ে এবং সে আর কখনও বিনা হুঁশিয়ারীতে শূন্যে উঠে যাবে না জেনে আমি আনন্দিত হই। নতুন চাঁদ ওঠার পরে তার প্রেতশক্তি চলে যায়। সে স্থিত হয় স্বাভাবিক জীবনে।

সুবলকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনতেও কোন কষ্ট হয়নি। ওসি অর্জুন মেহরা হংস ভরদ্বাজ আর তার মস্তান বাহিনীকে পাকড়াও করতে পেরে এত খুশি হন যে সুবলকে বিনা আপত্তিতে ছেড়ে দেন।

হিটলারের কি হলো তা নিশ্চয়ই শুনতে চাও? পুলিশরা তাকে হংস ভরদ্বাজের হাত থেকে উদ্ধার করে রেখে দেয় আমাদের জন্য।

মধ্যরাতে ডাক্তারকে নিয়ে থানায় যাই। যে রুমে হিটলারকে ওরা রেখেছিল সেখানে তুমুল শোরগোল ওঠে তখন। পুলিশরা ছুটে গিয়ে দেখে বিশালকায় এক উপজাতীয় লোককে কামড়াতে চেষ্টা করছে হিটলার। ওই লোকটা রহস্যময় ভাবে আবির্ভূত হয়েছে হিটলারের রুমে।

টিপ্‌রা উপজাতীয় লোকটা বিশ্রী ভাষায় গালাগাল দিচ্ছে। পুলিশরা আমাদেরকে দেখানোর জন্য নিয়ে আসে লোকটাকে। আমরা বলে উঠি, 'আরে, এ যে সেই মাধো ডাকাত!'

হ্যাঁ, মাধো ফিরে এসেছে। মেজাজ আগের মতই রুক্ষ। এ জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। কাবাব বনে যাওয়া, কুকুরের পেটে যাওয়া, কেইবা সহ্য করতে পারবে? সে দোষ দিতে চায় রিমকি আর আমাকে। আমার ভয় হলো ছাড়া পেলে কোন অন্ধকার রাতে সে প্রতিশোধ নিতে পারে আমাদের ওপর। একথা বললাম ওসিকে।

অর্জুন মেহ্‌রা ত্রিপুরার রাজ্য পুলিশের হাতে তাকে তুলে দেয়ার ব্যবস্থা করেন । বহু খুন ও ডাকাতির অপরাধে মাধোর ফাঁসি হয়ে যায়।

মাধোর প্রভাব চলে যাবার পর থেকে হিটলার আর মানুষের মত কথা বলতে পারে না। এতে দুঃখ হয় আমাদের। হিটলার খুব অভিজ্ঞ কুকুর। অনেক বুদ্ধি-বিবেচনার কথা বলত।

কথা বলার ক্ষমতা হারিয়ে প্রথম কয়েকদিন মনমরা হয়ে ছিল হিটলার। পরে এক মহিলা কুকুরের সঙ্গে তার ভাব হয়ে যায়। বেশ মনের সুখে তারা সংসার পাতে।

রিমকি আর আমি স্থির করি কলকাতায় ঘর বাঁধব। রিমকির একটা শাড়ির ভাঁজে পঞ্চাশ হাজার রুপীর নোটের বাণ্ডিল পাওয়া যায়। কৈলাশ

মাথুরকে ল্যাং মেরে কিমরি ওই নোটগুলো রেখে দিয়েছিল রিমকির শাড়ির ভাঁজে। ওটাই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের পুঁজি। প্যাটেলকে ওই টাকা ফেরত দেব কেন? তাঁর অঢেল টাকা রয়েছে। তাছাড়া আমাকে কলকাতার ব্যুরো চীফ রাখলেও ক্ষমা করতে পারেননি। এখনও খোঁজ নেন ভাল পাগলা-গারদ কোথায় আছে আমাকে রাখার জন্য।

ডাক্তার ঘোষাল আগের পেশায় ফিরে গেছেন। সুবল রয়েছে তাঁর সঙ্গে। তারা আমাদের সাথে থাকতে চান, একই বাড়িতে। আমরা রাজি হই। এত বিপদ-আপদে একসাথে ছিলাম তো। মায়া কাটাতে পারিনি। হিটলার আর তার মহিলা বন্ধুকেও নিয়ে আসি।

রিমকির বাপের দেখা পাইনি কখনও। লোকটা হারিয়ে গেছে রিমকির জীবন থেকে।

ছোট গল্পকার হিসাবে কিছু নামযশ হয় আমার। রিমকি ব্যস্ত হয় তার আসন্ন মাতৃত্ব নিয়ে।

আমি চেয়েছিলাম একটি ছেলে হোক। শেষ পর্যন্ত ছেলেই হয়। দেখতে মায়ের মত। আমার চেহারা পায়নি। তাকে নিয়ে আমাদের আনন্দ আর ধরে না।

প্রেতবিদ্যা, প্রেতশক্তি, গুণ্ডা-মস্তান, পুলিশ ইত্যাদির পালা শেষ হয়েছে। এখন চলবে শান্তিপূর্ণ নিরুপদ্রব জীবনযাত্রা। এরকমই ভাবলাম আমরা।

একদিন সকালে টেবিলে বসে একটা গল্পের প্লট ভাবছি। হঠাৎ শুনলাম এক তীক্ষ্ণ চিৎকার। লাফিয়ে উঠে কলম ছুঁড়ে ফেলে ছুটে গেলাম লনে।

রিমকি, ডাক্তার, সুবল ঊর্ধ্বমুখী হয়ে তাকিয়ে আছে। তাদের

চেহারায় মহা আতঙ্কের ছাপ।

আমিও তাকালাম।

প্রায় ত্রিশ ফুট ওপরে বাতাসের ওপর বসে আছে আমার ছোট্ট শিশুটি। হাতের পুতুলটি নেড়ে খেলছে আর হাসছে!

শরীফ আর অনিতা মুগ্ধ হলো কাহিনীটা শুনে। মুগ্ধ তারা কাহিনীর সব মূল চরিত্রকে দেখেও। রিমকি সামন্ত (এখন সোম) আর অনিতার দু'দিনেই ভাব হয়ে গেল গলায় গলায়। শরীফের পীড়াপীড়ি আর সাগরের অনুরোধে ম্যাজিকের কয়েকটা খেলাও দেখাল রিমকি। ওদের বাচ্চাটি তো অনিতার গায়ে লেপ্টেই রইল। ডাক্তার ঘোষাল, সুবল, হিটলার আর তার বান্ধবী সবাইকে ভাল লাগল শরীফ দম্পতির। ঢাকার উদ্দেশ্যে বিদায় নেয়ার আগে ডাক্তার ঘোষাল বললেন, 'মানুন বা না মানুন, অতিপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় ব্যাপার-স্যাপার এখনও ঘটে। আর হিপনোটিজম, তন্ত্রমন্ত্র এসবও তো চলছে বিজ্ঞানের জয়জয়কারের এ যুগেও। আমাদের অভিজ্ঞতাকেও ওই ধরনের কিছুর প্রভাবে সংঘটিত বলে ধরে নিতে পারেন। না পারলেও আপত্তি নেই। ভাবতে পারেন আষাঢ়ে গালগল্প। তবে সাগরের বর্ণনাটা নিশ্চয় ভাল লেগেছে আপনাদের?'

শরীফ আর অনিতা প্রায় একসঙ্গে বললেন, 'শুধু ভাল নয়, দারুণ উপভোগ করেছি।'

—০—

প্রেতশক্তি

তাহের শামসুদ্দীন

জাদুকরের মেয়ে রিমকি। রূপ আর লাবণ্যে মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মত। হাত-সাফাইয়ে তুলনাহীন। ঘটনাচক্রে হয়ে পড়ে পকেটমার। নিজের কেনা মারুতি গাড়ি নিয়ে ঘোরে ভারতের শহর থেকে শহরান্তরে।

পাখির মত স্বাধীন। আগরতলায় দেখা হয়ে যায় এক বুড়ো ডাক্তার, তার ষণ্ডা মার্কা সাগরেদ, আর এক তরুণ সাংবাদিকের সাথে। ওদের বুদ্ধিতে চলে যায় আঠারমুড়া পাহাড়ের গহন অরণ্যে। উপজাতীয় গুণীন মুংখ্রাকে জাদুর ভেল্কি দেখিয়ে বশ করার জন্য।

কিন্তু পড়ে যায় মুংখ্রার প্রেতশক্তির কবলে। তারপর ঘটতে থাকে অলৌকিক সব ঘটনা। একের পরে এক। অবিশ্বাস্য, লোমহর্ষক, হতবুদ্ধিকর এ কাহিনী এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০